একটী দ্বীপের চারি দিকে উপকূলে প্রবালেরা বাস করিল, ক্রমে বেশ সুন্দর ১ম ছবির মত একটী প্রবালাবাস নির্ম্মিত হইয়া কিছু কাল রহিল। তাহার পর, যে কারণে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নানা স্থান ক্রমশঃ নীচু হইয়া বসিয়া যাইতেছে, সেইজন্য হয়ত ঐ দ্বীপটীও ক্রমে নীচু হইয়া যাইতে লাগিল। দ্বীপ যত নীচু হইতে লাগিল প্রবালেরাও আবার তত উচ্চ করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেদিকে স্রোত ও বাতাসের ঢেউ বেশী সেই দিকের প্রবালেরা বাড়িতে লাগিল, এজন্য প্রবালাবাসের সাগরের দিক উহার দ্বীপের দিক অপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকিল। কাজে কাজেই ক্রমে মাঝ খানটা খালি পড়িয়া গেল। ইহাই ঐ দ্বীপ ও ঐ প্রবালাবাসের মধ্যস্থ জল প্রণালী Inner passage রূপে দাঁড়াইয়া গেল। আর পূর্ব্বের উপকূলস্থ প্রবালাবাস এক্ষণে Barrier Reef শ্রেণীতে পরিণত হইল। (২য় ছবি দেখ)।

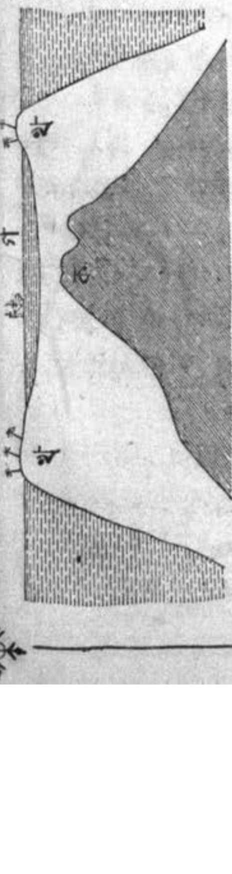

ক্রমে যত দ্বীপটী আরও বসিয়া গেল ততই প্রবালেরা চারিদিক ঘিরিয়া সাগরের দিকে উচু হইতে লাগিল, আর মাঝের জলপ্রণালী ততই বাড়িয়া বাড়িয়া বেশী স্থান দখল করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সমস্ত দ্বীপটী ডুবিয়া গেল তখন মধ্যে একটা হ্রদ জন্মিল, আর তার চারিদিকে গোলাকার প্রবালদের বাসস্থান, (Atoll) তাহার চারিদিকে নীল সাগর। এইরূপ "বারীয়ার রীফ্" ক্রমে Atoll অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপে পরিণত হয়। (ছবি দেখ)।

ক—দ্বীপটী একেবারে জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; খ—প্রবালনিবাস তাহার চারি ধারে ছাইয়া ফেলিয়াছে ও উপরে গোল হইয়া দেখা দিয়াছে; ছবিটী তাহারই মাঝ খান দিয়া জল চিরিয়া যেন দেখান হইয়াছে। গ—মধ্যের হ্রদ। ইহার গভীরতা অতি কম। দুই পার্শ্বে অতলস্পর্শ সমুদ্র।

পরমেশ্বর! তোমার অপার মহিমা! কত ক্ষুদ্র কীটাণু দিয়া তুমি কি আশ্চর্য্য কার্য্যই করিয়া লইতেছ!

কলের জাহাজ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে নিউ ইয়র্ক নগরের যেখান হইতে জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল, তাহার নিকটস্থ গৃহ সকলের ছাদ, জেঠী, নদীতীর প্রভৃতি সমুদয় স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ বারজন যাত্রীর উপযুক্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সকল আসনগুলিই পূর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের সম্মুখদিকে খালাসীদিগের জন্য ডেক্ বা পাটাতন; পশ্চাৎদিকে আরোহীদিগের ক্যাবিন্। কল কারখানা সমস্ত খোলা; যাহার ইচ্ছা সে দেখিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই কলে আগুন দেওয়া হইয়াছিল। সেই কারণে চিম্নি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধূম উত্থিত হইতেছিল। যে সকল জোড়ের মুখে একটু আধটু ফাঁক ছিল তাহা হইতে ষ্টীম্ (বাষ্প) উঠিতে ছিল। ফুল্টন স্বয়ং ডেকের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে খালাসী-দিগকে নানাবিধ আদেশ করিতেছেন। জন-কোলাহল ভেদ করিয়া তাঁহার স্বর সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। চারিদিকের উপহাস বিদ্রূপ ও নিরাশার কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি ধীর ও বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

সমুদয় আয়োজন ঠিক্ হইলে, কল চালাইয়া দেওয়া হইল; কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট জেঠী হইতে আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল। পরে যখন জাহাজ ঘুরিয়া নদীবক্ষে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তীরস্থ দর্শকগণেরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাত্রিগণের কণ্ঠ হইতে সেই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ফুল্টন কিন্তু নীরব। তাঁহার চেষ্টা এতদিনে সফল হইল এই আনন্দে, তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহার বিস্ফারিত নয়নের জ্যোতিতে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে।

ক্লারমণ্ট, ওয়েষ্ট পয়েণ্ট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে তত্রত্য দুর্গের সৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। নিউবর্গ নগরে জাহাজ পঁহুছিলে দেখা গেল সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। জলে স্থলে, নৌকায় ও নদীতীরস্থ পাহাড়ে লোক ধরে না। একখানি খেয়া নৌকা হইতে অনেকগুলি মহিলা হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া ফুল্টনের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। তিনি মাথা হইতে টুপি তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই অদ্যকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য।"

ফুল্টন তাঁহার এক বন্ধুকে আল্বানি যাত্রা সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, যাওয়া আসা উভয় সময়েই বায়ু প্রতিকূল ছিল; সুতরাং কেবল বাষ্পীয় বলেই জাহাজ চালাইতে হইয়াছিল। তথাপি স্রোতের প্রতি-কূলে যাইবার সময় এই দেড় শত মাইল পথ যাইতে ৩২ ঘণ্টা এবং আসিবার সময় অনুকূল স্রোত বশতঃ ৩০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। নদীতে অন্যান্য যে সকল জাহাজ ও নৌকা চলিতেছিল, ক্লারমণ্ট সে সমুদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমরা একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। গল্পটী সত্য। যিনি এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বয়ং ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।

প্রথম বারের যাত্রায় আল্বানি হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিবার সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া ফুল্টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার নাম বোধহয় মিষ্টার ফুল্টন?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"আপনি কি এই জাহাজ লইয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাইবেন?"

"আজ্ঞা, হাঁ; ইচ্ছা ত সেইরূপ।"

"আমি কি আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারি?"

"ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন।"

তাহার পর ঐ ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাড়া কত লাগিবে ?"

ফুল্‌টন যাহা বলিলেন তিনি তাহাই প্রদান করিলেন। কিন্তু ফুল্‌টন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে নিষ্পন্দ ভাবে ঐ টাকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভদ্রলোকটী মনে করিলেন, বুঝি ভ্রম-ক্রমে কম টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ঠিক্ হইয়াছে কি ?"

এই প্রশ্নে ফুল্‌টনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুখ তুলিয়া ঐ ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমার এত দিনের চেষ্টার প্রথম পুরস্কার আপনার প্রদত্ত এই টাকা। সেইজন্য এই টাকা পাইয়া আমার গত জীবনের সমুদায় কষ্ট একেবারে স্মৃতিপথে উপস্থিত হওয়াতে আমি সেই চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে কিছু জলযোগ করাইয়া এই ঘটনা স্মরণীয় করি। কিন্তু আপাততঃ আমি এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাও আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু আশা করি আমাদের পরস্পর আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, এবং তখন আর আমার এদশা থাকিবে না।"

চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ফুল্‌টনের কারবারের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ক্লার্-মেণ্টের নূতন শ্রী ও নূতন নাম (নর্থ রিভার) হইয়াছে। কার অব্ নেপচুন ও প্যারাগণ নামক আর দুই খানি জাহাজ গঠিত হইয়াছে এবং নিউ ইয়র্ক হইতে আল্‌বানি পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে কলের জাহাজ গতায়াত করিতেছে। সেই সময়ে একদিন উক্ত ভদ্রলোকটী উহার একখানি জাহাজে আল্‌বানি যাত্রা করেন। তিনি ক্যাবিনের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, ঐ ভদ্রলোকটী মিষ্টার ফুল্‌টন। কিন্তু তিনি কোন কথা না ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ফুল্‌টনের আসনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। অমনি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"আমি জানিতাম এ আর কেহ নহে, আপনি। আপনার আকৃতি আমি আজিও ভুলি নাই। এবং যদিও আমি এখনও ধনবান্ হইতে পারি নাই, তথাপি এখনও আপনাকে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

জলযোগের আয়োজন হইল। আহারের সময় ফুল্‌টন্ সাধারণের উপহাস, বিদ্রূপ, নিজের আশা, ভয়, বিঘ্ন, বিপদ প্রভৃতি সমস্ত বিগত বিষয় শীঘ্র শীঘ্র অথচ উজ্জ্বলভাবে বর্ণন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার চেষ্টা অবশেষে কেমন করিয়া সফল হইল, তাহাও বর্ণনা করিলেন। সমুদায় কথা শেষ করিয়া তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,—

"আপনার সহিত আল্‌বানিতে প্রথম সাক্ষাতের বিষয় অনেকবার আমার মনে হইয়াছে। এবং যখনই সে কথা মনে হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তখন আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাও উজ্জ্বলভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়। আমার তখন বোধ হইয়াছিল যে, আজি অবধি আমার দুঃখের অবসান হইতে চলিল ; অন্ধকারের পর আলোক দেখা দিল। আজিও

আমার ঐ কথা মনে হয়। কারণ, আমা দ্বারা যে জনসমাজের উপকার হইবে, আপনিই, প্রথমে আপনার কার্য্যদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঐ ভদ্রলোকটী নিজে এই গল্পটী বলিয়া গিয়াছেন।

আজি প্রায় আশি বৎসর হইল প্রথম কলের জাহাজ চলিতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এ সম্বন্ধে কত উন্নতি হইয়াছে! আজি কালি প্রায় এমন সমুদ্র বা গভীর নদী নাই যেখানে কলের জাহাজ যায় না। কলের জাহাজে ডাকের চিঠি আসিতেছে, কলের জাহাজে যাত্রী যাতায়াত করিতেছে, মাল আসিতেছে ; আবার দুই দেশে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন কলের জাহাজে করিয়া লড়াই পর্য্যন্ত হয়। প্রতিকূল বায়ু বা স্রোত ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। ইহা ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক বল ও মনুষ্যবুদ্ধির কীর্ত্তি-স্তম্ভ রূপে চতুর্দ্দিকে আপনার মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

—০—

নানা প্রসঙ্গ।

নং ৪

সাহসী বালক।

এক দিন আমরা * স্কুলে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম আমাদের সমপাঠী একটী বালক নিকটস্থ মাঠের দিকে একটা গরু লইয়া যাইতেছে। পথে একদল ছেলের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। ঐ দলের জ—ঠাট্টার বিষয় পাইলে কখনও ছাড়িত না। জ—বলিয়া উঠিল "কিহে! দুধের দাম কত? বলি উ—তুমি কোন্ ঘাস খাও? গরুর শিঙ্গে যে সোণাটুকু আছে তাহার দাম কত? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নূতন "ফ্যাশন্" দেখিতে চাও, তবে এই জুতা জোড়াটার পানে তাকাও"।

উ—একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, তারপর মাঠের চারিধারে যে বেড়া ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গরুটীকে ভিতরে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে আসিল। বিকালে স্কুলের ছুটীর পর গরুটীকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল।

এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। ইহাদের কতকগুলি আবার এমন মূর্খ ছিল যে, গরু মাঠে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া উ—কে ঘৃণা করিত।

ইহারা উ—র মনে কষ্ট দিবার জন্য নানা রকম বিশ্রী কথা বলিত। উ—তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সে সকল সহ্য করিত। একদিন জ—বলিল—

"কিহে উ—তোমার বাবা কি তোমাকে গোয়ালা করিতে চাহিতেছেন নাকি?"

উ—বলিল—"ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নয়, তবে দেখো যেন কেঁড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশী জল রাখিয়া দিও না।"

সকলে হাসিল। উ—কিছু মাত্র অপ্রতিভ

* এই "আমরা" অবশ্য সখার "আমরা" নহে।

না হইয়া উত্তর করিল "তার কোন ভয় নাই। আমি যদি কোন দিন গোয়ালা হই, তবে খাঁটী ওজনে খাঁটী দুধ দিব।"

এই কথাবার্ত্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার "প্রাইজ" দেওয়া হইল। তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ "প্রাইজ" দিলেন। উ—আর জ—উভয়েই খুব ভাল নম্বর পাইয়াছে; পড়া শুনায় তাহারা সমকক্ষ। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে অধ্যক্ষ বলিলেন যে আর একটী পুরস্কার আছে, সেটী একটী সোণার মেডেল। এই পুরস্কারটী সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে বলিয়া যে দেওয়া হয় না তাহা নহে, পুরস্কারের উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না বলিয়াই দেওয়া হয় না। পুরস্কারটী সৎসাহসের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। তিন বৎসর হইল প্রথম শ্রেণীর একটী ছেলে একটী গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটী দেওয়া হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ তার পর উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া একটী ছোট গল্প বলিলেন।

"অনেক দিনের কথা নয়; কতক গুলি বালক রাস্তায় ঘুড়ী উড়াইতেছে, এমন সময় একটী ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছেলেটীকে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে এত আঘাত পাইল যে, কয়েক সপ্তাহ তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের জন্য এই বিপদ ঘটিল তাহারা কেহই আহত ছেলেটীর সঙ্গে গেল না। কিন্তু একটী ছেলে দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়াছিল, সে যে কেবল আহত ছেলেটীর সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নহে, কিন্তু শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে থাকিল।

"এই ছেলেটী শীঘ্রই জানিতে পারিল যে আহত বালকটী একটী গরিব বিধবার নাতি। বিধবার এক গরু আছে, সেই গরুর দুধ বিক্রী করিয়া সে সংসার চালায়। বিধবা বৃদ্ধ এবং খোঁড়া; এই নাতিটী ছাড়া, তাহার গরু মাঠে নিয়া দেয় এমন লোক নাই। সেই নাতিটী আঘাত পাইয়া এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বালক বলিল 'আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আপনার গরু মাঠে লইয়া যাইব।'

"কিন্তু এই খানেই তাহার সৎকার্য্যের শেষ হইল না। ঔষধের জন্য টাকার আবশ্যক হইল। বালক বলিল, 'মা আমাকে বুট কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমার বুট না কিনিলেও চলে।' বিধবাটী বলিল 'তাহা হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে এক জোড়া জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছিলাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এই গুলি কিন, তাহা হইলেই বেশ হয়।' বালক সেই কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনও সে তাহা পরিতেছে।

"স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা দেখিল যে এক জন ছাত্র একটা গরু লইয়া যাইতেছে; সুতরাং তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার গরুর চামড়ার জুতা দুইটার উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা পরিয়া বিধবার গরু চালাইতে লাগিল। অন্যেরা তাহাকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এই বালক তাহার কথা ভাবিলও না। ভাল কাজ করিতেছে, ইহা মনে করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। গরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সে চেষ্টা করে নাই, কারণ সৎকার্য্য

করিয়া গর্ব্ব করাটা তাহার ভাল লাগিত না। ঘটনা ক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন।

"এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই বালকের আচরণে কি আপনারা প্রকৃত বীরত্ব দেখিতে পান নাই? উ—বাবু তুমি ব্ল্যাক্ বোর্ডের পেছনে পলাইওনা। বিদ্রূপের সময় তুমি ভয় পাও নাই, প্রশংসার কালে ভয় পাইলে কেন?"

উ—নত মুখে জড় সড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই কুৎসিৎ জুতা দুইটা এখন তাহার পায়ে কেমন শোভা পাইল। তাহার মাথায় মুকুট দিলেও হয়ত তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে দেওয়া হইল, সকলে আনন্দে উচ্চ করতালি দিতে লাগিল। অন্যান্য যে সকল ছেলেরা উ—কে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এখন যারপর নাই লজ্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিল।

(অনুবাদিত)

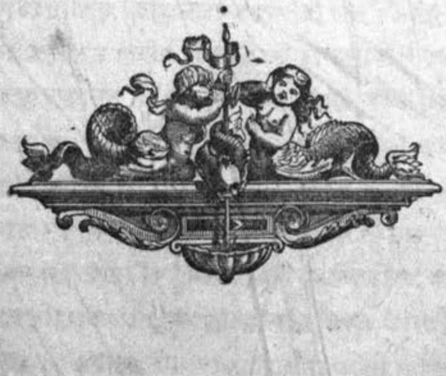

শিশুর আমোদ।

সুন্দর বাগান খানি নয়ন রঞ্জন
নানাজাতি তরু লতা কেড়ে লয় মন!
সু-নীল আকাশ প্রায় শোভার আকর,
শ্যামল দুর্ব্বার দল শোভে থরে থর!
সুন্দর হরিণ-শিশু দেখরে তথায়,
আপন মনেতে ওই চরিয়া বেড়ায়।
সু-নীল ফিতায় বাঁধা গলায় ঘুমুর,
ঝুণু ঝুণু রবে কিবা বাজিছে মধুর!
কচি কচি ঘাস গুলি খুঁটে খুঁটে খায়,
থেকে থেকে চারিদিকে ফিরে ফিরে চায়।
জানে বুঝি কোন ভয় নাহিক হেথায়,
প্রফুল্ল মনেতে তাই চরিয়া বেড়ায়!

কে ওই শিশুটি সাঁজো-ফুলের মতন!
কাহার সোণার যাদু আদরের ধন?
আ মরি কি সুবিমল কমল বদন!
ননীর পুতুল কিরে সুন্দর এমন?
ধরেছে দুধের বাটি কচি হাত দুটী,
হেলিয়া দুলিয়া শিশু আসে গুটী গুটী!
কচি কচি মুখ খানি সুধা হাসি তায়,
কি শোভা হ'য়েছে ওরে কে দেখিবি আয়!

হরিণের কাছে শিশু আসিয়া আদরে
"আয়" "আয়" ব'লে ডাকে সুমধুর স্বরে!
চমকি হরিণী-শিশু চাহিয়া দেখিল,
নিমেষে শিশুর কাছে ছুটিয়া আসিল।
সোহাগে বুকের মাঝে মাথাটি রাখিয়া
কত ভাবে ভালবাসা জানাইল গিয়া।

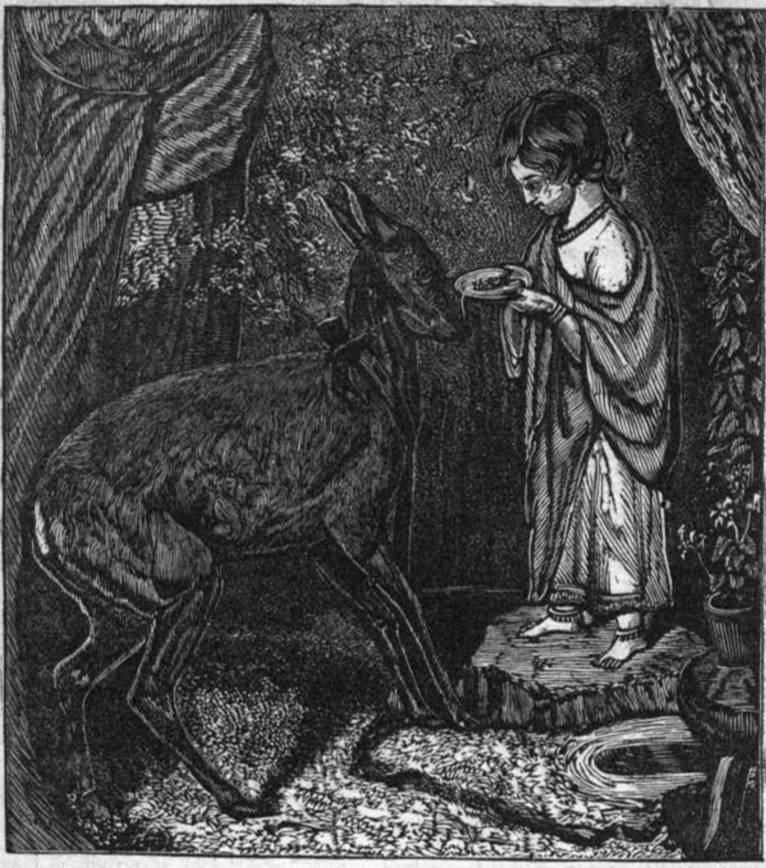

শিশুমণি হরিণের গলাটি ধরিয়া ;
কতই আদর করে মুখে চুম দিয়া !
দুধের বাটিটী নিয়ে দিল তার মুখে,
চুক্ চুক্ খায় পশু মহা মন-সুখে !
দেখিয়া বাড়িল রঙ্গ শিশুর অন্তরে,
নেচে নেচে করে গান আধ আধ স্বরে !
সরল হৃদয় ভরা বিমল আমোদ,
পৃথিবীর নহে এত হয় হেন বোধ !
আয় আয় কেরে তোরা দেখিবি নয়নে,
স্বর্গের বিমল ছবি শিশুর বদনে !
পশু পক্ষিগণে হেন দয়া করে যারা।
মরুভূমে ঢালে যেন অমৃতের ধারা !

লণ্ডন-মেলা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা অনেকেই হয়ত খবরের কাগজে পড়ে থাক্‌বে অথবা লোক মুখে শুনে থাক্‌বে যে, গত মে মাস হইতে লণ্ডন নগরে একটী প্রকাণ্ড মেলা আরম্ভ হইয়াছে। মেলার নাম দেওয়া হইয়াছে "ঔপনিবেশিক ও ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনী।" অর্থাৎ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত এই ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর আর আর জায়গায় যে সকল উপনিবেশ আছে, সেই সকল স্থানের কৃষি, শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যাদি এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া এই মেলায় দেখান হইতেছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকে এমন মেলার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইংরেজী ১৮৫১ সালে আমাদের ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত স্বামী সর্ব্ব প্রথমে তথায় একটী প্রকাণ্ড মেলা খুলেন। তারপর উঁহার দেখাদেখি গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রাজ্যে আরও অনেকগুলি ছোট বড় মেলা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৮৭৮ সালের পারিস-মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও জম্‌কাল। যাহা হউক পারিসের ন্যায় বড় রকম মেলা যেখানে যেখানে হইয়াছে সে সকল স্থানেই ভারতবর্ষ ও ব্রিটীশ উপনিবেশ সমূহের শিল্প দ্রব্যাদি দেখান হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডের খুব অল্প সংখ্যক লোকেই সে সমস্ত দ্রব্য দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক শিল্পী ও ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষের শিল্প-নৈপুণ্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। এখানকার ও অপরাপর স্থানের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া তাহার অনুকরণে সস্তা জিনিস তৈয়ার করিয়া আপনাদের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকদিগের বড়ই ইচ্ছা। সুতরাং ইংরেজ শিল্পীগণ যাহাতে বহুদূর দেশে না যাইয়া আপনাদের দেশে বসিয়া নানা স্থানের শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও অভাব পূরণ করিতে পারেন তাহার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আল্‌বার্ট লণ্ডনে একটী মেলা খুলিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস দেখান হইয়াছে। তারপর অন্যান্য মেলায় এখানকার যত জিনিস দেখান হইয়াছে তাহাদের ব্যবহার ও ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা কেবল পুস্তক আকারে বিলাতের লোকেরা পাঠ করিয়াছেন। এবারে কিন্তু ভারতবর্ষের কথা আরও ভাল করিয়া জানিবার জন্য অনেক প্রকার নূতন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এবারে বঙ্গদেশ হইতে দুইজন ও বোম্বাই হইতে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী লণ্ডনে যাইয়া সেখানকার লোকদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। এ ছাড়া এখানকার অনেকগুলি ভাল ভাল কারিকর সেখানে যাইয়া দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহাদের দোকানে কার্পেট, বারাণসী শাড়ী, কাঠের উপর খোদাই করা নানা প্রকার জিনিস, পিতলের বাসন, মাটির বাসন ও সোণারূপার গহনা প্রভৃতি কত রকম জিনিস তৈয়ার হইতেছে। শিক্ষিত ইংরেজ কারিকরগণ তাহার হাটহদ্দ দেখিয়া লইতেছেন। এখন বোধহয় অনেকে বুঝিতে পারিতেছ যে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া এক একটী মেলা খুলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কিছুই নহে কেবল পাঁচ জাতির দেশের জিনিস এক জায়গায় জমা করিয়া পরস্পরের শিল্পনৈপুণ্যের তুলনা করা ও অপর জাতির নিকট হইতে যাহা কিছু শিখি-

বার আছে তাহা শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতি, কল্যাণ ও সুখ বৃদ্ধি করা। ইংরেজেরা এইরূপ মেলা দ্বারা যে উপকার লাভ করেন আমরা তাহার কি বুঝিব? যদি বুঝিতাম তবে আজ আমাদের এত দুঃখ থাকিত না, যাহা হউক এ সকল কথা আর অধিক করিয়া আজ বলিতে চাহি না।

ভারতবর্ষের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বসতি, এরূপ পৃথিবীর আর কোনও রাজ্যে দেখা যায় না। ইংরেজগণ যতগুলি জাতির উপর রাজত্ব করিতেছেন এতগুলি জাতির উপর রাজত্ব করাও পৃথিবীর অপর কোন সুসভ্য জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যাহাদের উপর ইংরেজের অধিকার তাহাদের সকল শ্রেণীর লোকের চেহারা পর্য্যন্তও অনেক ইংরেজ দেখেন নাই। যাঁহারা বিলাত ছাড়িয়া কখনও ভারতে আসেন নাই তাঁহারা এখানকার লোকদিগকে কেমন করিয়া দেখিবেন? বাস্তবিক আজকাল এদেশ হইতে যাঁহারা বিলাতে কৃষি, আইন, শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন সেই সকল সুসভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী, পার্সী, বা মুসলমান যুবকগণ ভিন্ন অপর কাহারও মুখ বিলাতের ইংরেজগণ কখনও দেখিতে পান না। সেই জন্য একদিকে যেমন ভারতবর্ষের নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য লণ্ডন মেলায় সংগ্রহ করিয়া সকলকে দেখান হইতেছে; অপর দিকে এখানকার নানা স্থানের মানুষ চিনিবারও একটী বেশ সুন্দর উপায় বাহির করা হইয়াছে। আসাম অঞ্চলের নানাপ্রকার পাহাড়ী জাতি, ছোটনাগপুরের অর্দ্ধসভ্য জঙ্গলবাসী, শিখ, পঞ্জাবী, গোরক্ষ ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি সৈনিকদলভুক্ত বীরগণ; এবং ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের অধিবাসী প্রভৃতি অনেকগুলি পুরুষ ও রমণীর পূর্ণাবয়ব মাটির প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মেলা স্থলে সাজান হইয়াছে। এইরূপ প্রায় দুইশতেরও অধিক চেহারা ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে পাঠান হইয়াছে। বিলাতিবাসীরা ঐ সকল চেহারা দেখিয়া বড়ই খুসী হইয়াছেন। সেখানকার বড় বড় খবরের কাগজে ঐ সকল চেহারা ছাপা হইতেছে। আমরাও পাঠক পাঠিকাদিগকে দেখাইবার জন্য আন্দামান দ্বীপের পুরুষ ও রমণীর একখানি ছবি দিলাম। সকলে দেখ দেখি এমন কদাকার ও অসভ্য জাতির ছবি আর কখনও দেখেছ কি না।

যাহাদের চেহারা দেওয়া হইল উহাদিগকে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। উহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েও অনেকগুলি আসিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে ইহাদিগের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলি, শুন।—

আন্দামানবাসীদিগের গায়ের রং কেমন কাল তাহা বোধ হয় অনেকে ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ। আফ্রিকার নিগ্রো বা কাফ্রিদিগের অপেক্ষাও যেন ইহারা একটু বেশী কাল। মাথার চুলও কাফ্রিদের মত খুব ঘন। আবার গায়ের গন্ধ এমনি ভয়ানক যে বেশীক্ষণ ইহাদের কাছে দাঁড়ান যায় না। ইহারা প্রায় উলঙ্গবেশে বনে বনে বেড়ায়। লজ্জা নিবারণ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে কখন কখন কোমরে কেবল মাত্র গাছের পাতা বা ছাল জড়াইয়া কোন মতে একটু কৌপিনের মত আচ্ছাদন ব্যবহার করে। ইহাদের অলঙ্কারের মধ্যেও বেশীর ভাগ গাছের পাতা লতা এবং শামুক, গুগ্‌লি, সমুদ্রের কীট অথবা ছোট ছোট হাড়ের মালা। ইহারা তীরধনুকের সাহায্যে বনের পশু মারে

ENG. BY T.N. DEB

ও তাহাদের মাংসে উদরের জ্বালা নিবারণ করে। কাঁচা মাংসে ইহাদের অরুচি নাই, সুতরাং মাংস রাঁধিবারও বড় দরকার করে না; আবার শুনা যায় যে নরমাংসও ইহাদের নিকট পার পায় না। কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার মাংস খাইয়া ফেলে, তাহার মাথার খুলিটী যত্নের সহিত অঙ্গে বহিয়া বেড়ায় এবং তাহার হাত পায়ের সরু সরু হাড়ে কোন রকম অলঙ্কার অথবা বাজাবার বাঁশী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। নেশায় ইহারা এত পটু যে, যে মদ খুব চড়া, যাহার একগুণ খাইলে এ দেশের বড় বড় মাতালেরা ঢলিয়া পড়ে, আন্দামানীরা অবলীলাক্রমে তাহার তিন গুণ পান করে। সর্ব্বক্ষণ নেশা করিয়াও ইহাদের আশা মিটে না। ধূমপানেও ইহারা খুব মজপুত। তামাক বল, চুরট বল, যত দাও ততই টানিবে। বলিতে কি নেশা ক'রে ক'রে ইহাদের এক এক জনের প্রকৃতি এমনই হ'য়ে পড়ে যে, সে চব্বিশ ঘণ্টা কেবলই অলস ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকা ভিন্ন জীবনে আর কোনও সুখ চাহে না। এক কথায় বলিতে কি ইহাদের চাল চলন দেখিয়া ইহাদিগকে রাক্ষস অথবা নররূপী পশু ভিন্ন আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

আন্দামানবাসীরা যখন কলিকাতায় ছিল তখন চৌরঙ্গীতে একদিন ইহাদের নাচ হয়। সে নাচের মাঝে মাঝে কেবল ভয়ানক লাফা-

লাফি, মুখে একরূপ বিকট চীৎকার এবং বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই।

ফুলের সাজি।

(৯৪ পৃষ্ঠার পর।)

এক দিন হেমলতা মনোরমাকে বলিল, "মনোরমে কাল আমার জন্মতিথিপূজা, তুমি প্রত্যুষে উঠিয়াই এখানে আসিবে, তোমার কাল আমাদের বাড়ী ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ রহিল। মনোরমা বলিল "রাজকুমারি আপনার দয়ার গুণে আমি দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছি আপনার যেরূপ অভিলাষ তাহাই হইবে।" সে সে দিন বাড়ী গিয়া পিতাকে আগেই রাজকন্যার জন্মতিথি ও তদুপলক্ষে তাহার নিমন্ত্রণের কথা জানাইল। তখন দীননাথ কহিল, "তবে তুমি সকালেই আমার জন্য রন্ধন করিয়া রাজকুমারীর নিমন্ত্রণে যাইবে, কিন্তু সাবধান আমরা গরিব, আমাদের সহিত রাজ পরিবারের সম্বন্ধ বিপদশূন্য নহে, আমি বহুদিন রাজি সংসারে কর্ম্ম করিয়া বেশ জানি যে, যাহারা আজ রাজা বা মহিষীর প্রিয়পাত্র, তাহারা আবার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের চক্ষুশূল।" মনোরমা কহিল "সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, হেমলতার গুণের তুলনা নাই, আমি তাহার স্বভাব ও আচরণে বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা, আমি তাঁহাকে তাঁহার জন্মদিনে কি উপহার দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

দীননাথ। মা, আমরা দরিদ্র, কি উপহার দিয়া রাজতনয়ার সন্তোষ বিধান করিতে পারি বল? আমি বলি অন্য কিছু না দিয়া সে দিন আমি যে ফুলের সাজিটী তৈয়ার করিয়াছিলাম, উত্তম উত্তম ফুল দিয়া সাজাইয়া সেই সাজিটী রাজকন্যাকে উপঢৌকন দেও, মূল্যবান বস্ত্র বা অলঙ্কার অপেক্ষা ইহা অধিক মনোনীত হইবে সন্দেহ নাই।

মনোরমা। বাবা, আমিও এক একবার ভাবিতেছিলাম যে, আমাদের বাগানের উত্তম উত্তম ফুলগুলি তুলিয়া রাজকন্যাকে উপহার দিব। আমায় তুমি যে সাজিটী দিয়াছ তাহার চমৎকার গঠন, তাহাতে কত কাজ; আমি ও তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহাই উপযুক্ত বোধ করিতেছি।

আজ হেমলতার জন্মতিথিপূজা, রাজ-উদ্যান জনাকীর্ণ; তোরণ হইতে প্রত্যুষে নহবৎ ধ্বনি হইতেছে। উদ্যান পথের দুই পার্শ্বে মঙ্গল ঘট ও কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যানে আজ সমস্ত উৎসবময়, কাহারও মুখে নিরানন্দ নাই। রাজ প্রসাদ পাইব বলিয়া দাস দাসীরা আজ মহাআনন্দিত। উদ্যান বাড়ী পুষ্প ও পত্রে সজ্জিত এবং সুগন্ধ ধুনা ও গুগ্গুলের গন্ধে রাজভবন যেন একটী দেবভবন হইয়াছে।

মনোরমা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদায় গৃহকর্ম্ম সমাপন করিল। এবং তাহাদের উদ্যান হইতে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ, বেল, যুথিকা প্রভৃতি কুসুম সাজি

ভরিয়া তুলিল। কতকগুলি চমৎকার মালা গাঁথিয়া, তাঁহার মধ্যে "রাজকুমারী হেমলতার জন্য" লিখিল। এইরূপে সাজিটী অত্যন্ত মনোহর হইল। যখন স্নানান্তে দাসিগণ হেমলতার বেস বিন্যাস করিয়া দিতেছে তখন মনোরমা তাঁহার নিকট আসিয়া সাজিটী স্থাপন করিল, হেমলতা সাজিটী দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। কুমারী আজ কত ভাল বস্ত্র ও অলঙ্কার পাইয়াছেন কিন্তু কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

হেমলতা বলিলেন "মনোরমে তোমাদের বাগানে দেখ্‌ছি আজ আর একটী ফুলও রাখ নাই, এ সাজিটী কে বুনেছে, আহা! ইহার কারু কার্য্য অতি চমৎকার! মনোরমা কহিল "সাজিটী আমার পিতার হস্ত-নির্ম্মিত।"

রাজ কুমারী মনোরমাকে লইয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং আনন্দের সহিত মনোরমার সাজিটী মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন, দেখ মা, এটী কি মনোহর উপহার! আমিত কখন এমন চমৎকার সাজি দেখি নাই, আহা! এই ফুলগুলি আমাদের বাগানের ফুলের অপেক্ষা অনেক বড়।

রাজমহিষীও এই উপঢৌকন দেখিয়া মনে মনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন "যথার্থই এমন রমণীয় ফুল কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ফুল গুলি পূর্ণ বিকসিত ও সুগন্ধের আধার। এই সাজিপূর্ণফুল দেখিলে মনোরমার মনের সুন্দর ভাব ও রুচি বেশ বুঝা যায়। মনোরমা! একটু এখানে অপেক্ষা কর আমরা এখনি আসিতেছি" এই বলিয়া রাজ মহিষী হেমলতাকে গৃহান্তরে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। গৃহান্তরে গমন করিয়া রাজমহিষী কন্যাকে বলিলেন, "হেম আজ তুমি মনোরমাকে কিছু উপহার না দিয়া কখনও ছাড়িও না। বল দেখি তাহাকে কি উপহার প্রদান করিলে ভাল হয়?" হেমলতা বলিলেন,—মা, আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ী খানি দিলে হয় না? সেখানি আমি একবার মাত্র পরিয়াছিলাম।

রাজমহিষী হেমলতার কথায় অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন, হেমলতা মনোরমার নিকট গমন করিয়া কোন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার গৃহ হইতে আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ীখানি আনিয়া দেও, মনোরমাকে উপহার দিব। মায়া কুমারীর কথা শুনিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, রাণী মা এ কথা জানেন? হেমলতা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন "সে কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই, কাপড় এখানে আন।"

মায়া আর কথা কহিল না, মনে মনে গজরাইতে গজরাইতে গৃহ হইতে কাপড় আনিতে গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, রাজকন্যার ব্যবহৃত বস্ত্র কেবল আমারই প্রাপ্য। কোথা হইতে একটা চাষার মেয়ে আসিয়া আমার সে অধিকার লোপ করাইতেছে। রাজকন্যা আমাদের সঙ্গে আর তেমন কথা কহেন না। কেবল শুইতে বসিতে মনোরমা মনোরমা, যদি আমি ইহার শোধ লইতে পারি তবে জানিব আমার নাম "মায়া"। সে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বারাণসী কাপড় খানি হেমলতাকে আনিয়া দিল। হেম কাপড় লইয়া মনোরমার হস্তে দিয়া কহিলেন "ভাই তোমায় আমার প্রদত্ত এই উপহারটী গ্রহণ করিতে হইবে। সরলা মনোরমা রাজকন্যার আগ্রহ দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গ্রহণ করিল। মনোরমা গৃহে

প্রত্যাগমন করিল। মায়া সমস্ত দিন ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। সেই দিন বৈকালে যখন হেমলতা কেশ বন্ধন করিতেছেন তখনও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই, ক্রোধভরে কেশবন্ধন করিতে করিতে একবার একটু জোরে রাজকন্যার কেশ টানিল। তিনি মায়ার মনোভাব কথঞ্চিৎ বুঝিয়া বলিলেন "মায়া তুই কি মনোরমাকে কাপড় দিয়াছি বলিয়া রাগ করিয়াছিস্ ?"

মায়া মনের ভাব চাপিয়া বলিল, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার আবার রাগ কি ?

মনোরমা বাড়ী গিয়া আগে পিতাকে রাজকুমারীপ্রদত্ত কাপড় দেখাইল; তাহার মুখে আনন্দ ধরে না। কিন্তু দীননাথ কাপড় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না; সে তাহার পক্ক কেশযুক্ত মস্তক নাড়িয়া কহিল, বাছা এখন বোধ হইতেছে যে, ঐ ফুলের সাজি রাজবাড়ী না লইয়া গেলেই ভাল হইত। রাজ কন্যার প্রদত্ত উপহার বলিয়া আমি ইহাকে সম্মান করিতেছি সত্য, কিন্তু তোমাকে এই উপহার পাইতে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষাপরবশ হইবে; আর পাছে তুমি এই কাপড় পরিয়া মনে মনে গর্ব্বিতা হও ইহাও আমার বড় ভয় হইতেছে। সাবধান যেন এই কাপড় পরিধান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া না পড়।

বিনয়, লজ্জা, সত্যকথা ও মিষ্ট কথাই বালিকার যথার্থ অলঙ্কার।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

গতবারের নূতন প্রকারের ধাঁধার উত্তর অনেকেই দিয়াছেন; কাহারও রচনা প্রকাশযোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। উক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি মধ্যে যদি কেহ উক্ত ছবি অবলম্বনে একটী রচনা পাঠান, এবং তাহা যদি মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার রচনাই প্রকাশিত হইবে।

নূতন।

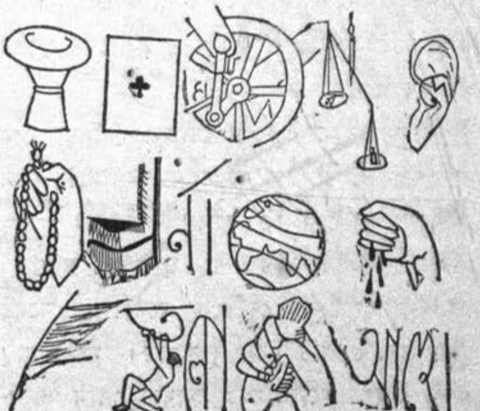

পড় দেখি ?

সখা
চতুর্থ ভাগ। অষ্টম সংখ্যা।
আগষ্ট, ১৮৮৬।

পৃথিবীর গোলত্ব।

তোমরা সকলেই ভূগোলসূত্রে পৃথিবী যে গোল তার তিনটী প্রমাণ পড়িয়াছ; বেশ্ করিয়া মুখস্থ করিয়াও রাখিয়াছ; কিন্তু ঐ বিষয়ে উত্তম রূপ বোধ না হইলে সুবিধা নাই। কিছুদিন হইল আমি একখানি বাঙ্গালা বৈ দেখিয়াছিলাম তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা, একজন বিদ্বান ভট্টাচার্য্য, নানা শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া ও নিজের গভীর তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পৃথিবী কখনও গোলাকার নহে এবং দধি সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতি যত সমুদ্র আছে, তাহাদের তীরে ৪০ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বথ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি!—যখন এই বৈ খানা দেখিলাম তখন মনে হইল যে এত বিজ্ঞান ও সুশিক্ষার মধ্যেও এ প্রকার বৈ ছাপা হয় আর পড়া হয়। কি জানি যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সেই রকম কোন পণ্ডিতের সম্মুখে পড় তাহা হইলে হয়ত তোমাদের বিশ্বাস টলিয়া যাইবে; পৃথিবী গোল নয় হয়ত বলিয়া বসিবে। সুতরাং এ বিষয়ে শুদ্ধ তিনটী প্রমাণ মুখস্থ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বেশ্ করিয়া কথাটা বুঝা দরকার। তাই আজ আমরা এই বিষয়ে কিছু খুলিয়া লিখিব মনে করিয়াছি। মন দিয়া বুঝিয়া পড়িলে ও মনে রাখিলে কেহ আর ঠকাইতে পারিবে না।

আচ্ছা মনে কর পৃথিবী গোল নয়। একটা সীমাবিহীন বা খুব বড় ময়দানের মত কেবল লম্বা চওড়া জমী। তাহা হইলে কি ভুল হয় দেখা যা'ক। এই রকম উল্টা দিক দিয়া বিচার করিলে সুবিধা হয়। যেমন তোমাদের গ্রামের বড় মাঠটা, পৃথিবী যদি তেমনি হয় ত কি দোষ?—বেশ্! তোমাদের বাড়ীর ছাতটা খুব বড় তার এক ধারে আল্‌শের কাছে শুয়ে তোমরা গল্প ক'রছ। এখন হঠাৎ এক ধারের আল্‌শের কাছে যদি একটা প্রদীপ জ্বালা যায় তা কি তোমরা দেখিতে পাবে না? অবশ্য পাবে। এমন কি, ছাতের ও পাশে যদি একটা জোনাকি পোকা থাকে তাও দেখিতে পাও। কিন্তু একটা বড় জালার এক পাশে চক্ষু দিয়া দেখিলে তাহার অন্য পাশের পিঁপড়ে দেখা যায় না। কেননা পিঁপড়ে জালার ফুলা গায়ের জন্য ঢাকা থাকে। কোন বড় মাঠের একধারে একটা আগুন জ্বালিলে ওধার থেকে বেশ দেখা যায়।—কিন্তু একটা ছোট পাহাড়ের একধারে আগুন থাকিলে ওপার থেকে দেখা যায় না, পাহাড়ের উঁচু ভাগে ঢাকা থাকে।

পৃথিবীকে আমরা মাঠের মত সমান ধরিয়াছি। তাহা হইলে তাহারও একদিকে যদি আগুন জালি তবে সব জায়গা থেকে দেখা যাবে। তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে যখন সূর্য্য উঠিবে তখন যেমন আমরা দেখিতে পাইব, পৃথিবীর সব স্থান থেকেই সব লোকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইবে। তোমরা বলিয়া উঠিবে "তাত পাবেই, যতক্ষণ গাছ পালার আড়ালে থাকিবে ততক্ষণ সকলে দেখিতে পাইবে না। যেই ভাল করিয়া উচ্চ হইয়া আকাশে উঠিবে; অমনি পৃথিবী শুদ্ধ লোকে এক সঙ্গে সূর্য্য দেখিতে পাইবে সন্দেহ কি?" কিন্তু, সমস্ত পৃথিবীর লোক এক সঙ্গে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে না, এক সঙ্গে অস্ত যাইতেও দেখে না। আমাদের দেশে যখন প্রথম সূর্য্য দেখা দেয়, সেই ভোর বেলা যখন আমরা উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পড়িতে বসি, আমাদের পশ্চিমে যাদের বাড়ী,—যত দূর দেশে তারা তত পরে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে, আর তত পরে অস্ত যাইতেও দেখে; আর আমাদের পূর্ব্ব দিকে যাদের বাড়ী,—যত দূরে তারা তত আগে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে পায়। তোমরা জান ইংলণ্ড দেশ আমাদের দেশের পশ্চিমে অনেক দূরে। এই জন্য আমাদের এখানে যখন সূর্য্য উঠে, তখনও সেখানকার লোকেদের অর্দ্ধেক রাত্রি, যখন এখানে বেলা দুই প্রহর তখন বিলাতে প্রাতঃকাল। যখন আমরা সূর্য্য অস্ত যাইতে দেখি সেই সন্ধ্যা বেলা তাহাদের মধ্যাহ্ন, সূর্য্য তখন তাহাদের মাথার উপর! কি আশ্চর্য্য!! এ বিষয়ে একটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি যাহা দ্বারা ম্যাপ দেখিয়া যে কোন স্থান হউক না কেন তোমরা বলিয়া দিতে পারিবে সেখানে সূর্য্য উঠিতে এখানকার চেয়ে কত দেরী লাগে বা শীঘ্র হয়। ম্যাপে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে সকল রেখা টানা থাকে তাহাদিগের দ্বারা ডিগ্রীর মাপ জানা যায়। বিষুব রেখার কাছে এক এক ডিগ্রী প্রায় ৭০ মাইল দূরে দূরে থাকে। আর এই এক ডিগ্রী দূরে যে সকল দেশ তাহাদের মধ্যে সময়ের তফাৎ ৪ মিনিট। অর্থাৎ অমাদের কলিকাতা হইতে যে স্থান ১ ডিগ্রী পশ্চিমে সেখানে কলিকাতা অপেক্ষা ৪ মিনিট পরে সূর্য্য উঠিয়া থাকে। যে স্থান কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পশ্চিমে তথায় ৬০ মিনিট বা এক ঘণ্টা পরে সূর্য্য দেখা যায়। আবার যে নগর কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পূর্ব্ব দিকে তথায় সূর্য্য কলিকাতার ১ ঘণ্টা আগে উঠে। বোধ হয় এখন সব যায়গার সঙ্গে তুলনা করিতে শিখিলে।

যাহা হউক দেখা গেল যে পূর্ব্ব দিকে যখন সূর্য্য আকাশে দেখা যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর সব লোক একবারে সূর্য্য দেখিতে পায় না। কেন পায় না? পৃথিবী মাঠের মতন হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত। তা যখন হয় না স্পষ্ট জানিতেছি (একস্থান থেকে আর এক স্থানে টেলিগ্রাম করিলেই জানা যায়) তখন কেমন করিয়া বলিব যে পৃথিবী মাঠের মত। নিশ্চয়ই পৃথিবী তেমন নহে। নিশ্চয়ই তবে অন্য রকম হবে। কলিকাতা ও ইংলণ্ডের মধ্যের ভূভাগ জালার পিঠের মত নিশ্চয়ই উঁচু, নহিলে এরূপ কেন হইবে?

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যে সমতল নহে, জালার মত, তাহার আরও একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সেটী প্রায় সকলেই পড়িয়াছ। যখন কোন জাহাজ সাগরের কিনারা হইতে দূরদেশে যাত্রা করে, তখন যদি তথায় অল্প ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাক,

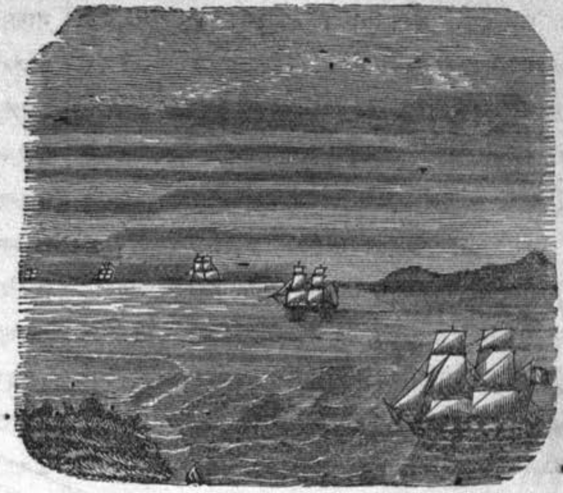

তবে বড় আশ্চর্য্য দেখিবে যে, প্রথমে জাহাজের লোক জন সব দেখা যাবে, ক্রমে যতই দূরে যাইবে ততই অল্প অল্প অস্পষ্ট বোধ হইবে। দূরের দ্রব্য কখনই নিকটের জিনিসের মত পরিস্কার দেখা যায় না। কিন্তু তখনও জাহাজের সবটা বেশ্ দেখিতে পাবে। ক্রমে যখন এক ক্রোশেরও বেশী দূরে গিয়া পড়িবে, তখন জাহাজের তলাটা যেন খানিকটা ক্ষয় হইয়া বা জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল বোধ হইবে। ক্রমে আরও একটু একটু করিয়া অনেকটা অদৃশ্য হইবে। শেষে জাহাজের কাষ্ঠ বা লৌহময় খোল-টুকুর আর কিছুমাত্র দেখা যাবে না, কেবল মাস্তুল ও পাল দেখা যাইবে। আরও দূর—শেষে বড় মাস্তলের আগাটুকু ঝিক্ ঝিক্ কর্‌ছে, তার পর, ঐ যা—কিছুই না। এইরূপে জাহাজ খানার নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্তটা অদৃশ্য হইয়া যায় কেন? অনেক দূর বলিয়াই কি এরূপ হয়? না, হ'তে পারে না। কেননা দূরের জিনিস ছোট দেখায় বটে, অস্পষ্টও দেখায় সত্য; কিন্তু তাহার সমস্ত অবয়বটাই ঐরূপ ছোট ও অস্পষ্ট দেখা যায়। কোন অংশই অদৃশ্য হয় না। তার পর আরও প্রমাণ এই যে, দূরের ছোট ও অস্পষ্ট দেখান বন্ধ করিবার জন্য যে দূরবীক্ষণযন্ত্র আছে তাহা দ্বারা খুব দূরের দ্রব্যও কাছে এবং বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি যদি ঐ যন্ত্র দ্বারাও জাহাজ খানার দিকে দেখ, তাহা হইলেও ঠিক ঐরূপ দেখিবে। অস্পষ্ট ও ছোট দেখাইবে না কিন্তু ঠিক বোধ হবে যেন জাহাজের তলা থেকে উপর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে *। তোমার ও জাহাজের মধ্যের জলভাগ যদি মাঠের মত সমতল হইত তাহা হইলে কখনই এইরূপ একটু একটু করিয়া জাহাজের নিম্ন অবয়ব গুলি ও

* এক কিম্ভূত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সমতল হইলেও নাকি এইরূপই দেখা যাইবে। তিনি অনেক মাথা ঘুরাইয়া ইহার পক্ষে যুক্তিও দিয়াছেন, সে বড় চমৎকার যুক্তি—তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। উপরকার বায়ুর চাইতে নীচেকার বায়ু বেশী ঘন, তা তোমরা অনেকেই জান। আচ্ছা দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায় কেন? না সাম্‌নের বায়ুতে দৃষ্টিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে রোধ করে বলিয়া। অনেক দূরের জিনিস হইলে অনেক বায়ু সাম্‌নে পড়ে, সুতরাং আরো অস্পষ্ট দেখা যায়। বাতাসটা যদি আরো ঘন হইত, তবে এর চাইতে কাছের জিনিসই ঐরূপ অস্পষ্ট দেখা যাইত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে মাস্তুলের আগাটা আমরা সকলের চাইতে পাতলা বাতাসের

অবশেষে সমস্তটা অদৃশ্য হইত না। নিশ্চয়ই ঐ মধ্য ভাগের জল জালার পিঠের মত ঈষৎ ফুলিয়া আছে। ঐ ফুলা এত কম যে হঠাৎ চক্ষে দেখা যায় না কিন্তু এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ বুঝা যাইবে যে ঐরূপ ফুলো নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গায় স্নান করিবার সময়ে চক্ষু জলের কাছে রাখিয়া দূরের নৌকা দেখিলেও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমরা বরং চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

এই পরীক্ষাটীর দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সাগরের জল মাঠের মত সমতল নহে, খুব প্রকাণ্ড একটা জালার পিঠের মত। আর পৃথিবীর ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ জল আর এক ভাগ মাত্র স্থলে আবৃত। সেই ৩ ভাগ অর্থাৎ বার আনা অংশ জলের যেখানে ঐ পরীক্ষা করা যাক না কেন, ঐ একইরূপ ফল দেখা যাইবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বার আনার আকার যে জলের মত, তাহা ঠিক হইল। বাকী যে যে চারি আনা স্থল তাহারও আকার ঐরূপ। প্রমাণ করাও কঠিন নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "বেড্‌ফোর্ড লেবেলে" তাহার বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ওয়ালেস্ নামক একজন সাহেব "ক" "খ" "গ" নামে ১৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণ তিনটী সমান উচ্চ খুঁটি ঠিক সোজা করিয়া (তিন) ৩ মাইল অন্তর অন্তর বসাইলেন। জমী যদি ঠিক সমতল হয়, তাহা হইলে ঐ তিনটী খুঁটিরই মাথা সমান থাকিবে। কিন্তু তিনি "ট" নামক এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন ভাবে বসাইলেন যে তাহাতে "ক" ও "গ" খুঁটির মাথা ঠিক সমান রেখায় দেখা যায়। তখন দেখা গেল যে "খ" খুঁটিটার মাথা ঐ রেখার ৫ ফীট উপরে আছে। ইহা বেশ ধীর ভাবে বুঝিলেই দেখিতে পাইবে যে, যেখানে "খ" পোতা ছিল সেখানকার মাটি ক ও গ এর তলা অপেক্ষা ৫ ফীট উঁচু। অর্থাৎ ঐ স্থানটা জালার পিঠের মত উঁচু বা ফুলা। ঐ ফুলা এত কম যে চক্ষু দ্বারা বুঝা যায় না।

ভিতর দিয়া দেখি সুতরাং সেটা সকলের চাইতে স্পষ্ট দেখা যায়। তার নীচের অংশটা তার চাইতে ঘন বাতাসের ভিতর দিয়া দেখি, (কারণ উপরের বাতাসের চাইতে নীচের বাতাস ঘন—যতই নীচে আসিতেছি বাতাস ততই ঘন হইতেছে,) সুতরাং সেটাকে মাস্তুলের আগার চাইতে অস্পষ্ট দেখি। এই কারণে তার নীচের স্থানটুকু আরো অস্পষ্ট দেখি। এইরূপে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া জাহাজের নীচের অংশ একবারে অদৃশ্যই হইয়া যায়। (ছবি দেখ) কিন্তু ক্রমশঃ

ঝাপসা হইয়া অদৃশ্য হওয়া আর একটা কিছুতে ঢাকা পড়িয়া অদৃশ্য হওয়া, এই দুয়েতে যে কি তফাৎ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি আশা করি তোমাদের মধ্যে এত বোকা কেহ নাই। সমুদ্রে যে জাহাজের নীচের অংশ অদৃশ্য হয় তাহা ক্রমশঃ ঝাপসা হইয়া নহে; কারণ অদৃশ্য অংশ যে জলে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পণ্ডিত মহাশয় ঘরের কোণে বসিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া ছিলেন কাজেই বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলিয়া উঠে নাই। পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকটী যুক্তি লইয়াই এই প্রকার এক একটা কাণ্ড করিয়াছেন। সবগুলির কথা শুনিলে পাছে গল্পের বিড়ালের মত হাসিতে হাসিতে তোমাদের পেট ফাটিয়া যায়, এই ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

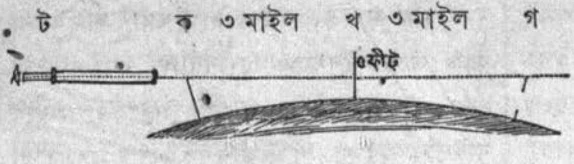

এই রূপে শত শত পরীক্ষা যারপরনাই যত্ন ও সাবধানতার সহিত করা হইয়াছে। সকল বারেই একই রূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কখনই ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ পৃথিবীর জল ভাগ এবং স্থলভাগ দুইই জালার পিঠের মত ফুলা, মাঠের মত সমতল নহে।

কিন্তু পৃথিবী যে বর্ত্তুল বা ভাঁটার মত গোলাকার জড় পিণ্ড, তাহা এখনও প্রমাণ হইল না। কেবল দেখা গেল যে থালার মত সমতল নহে। গোলাকার পিণ্ড মাত্রেরই এমন একটী গুণ আছে যাহা অন্য আকারের পিণ্ডের নাই। সেটী এই যে—উহাকে যে দিক দিয়াই দেখনা কেন, গোল দেখাইবে। মনে কর গোল থালা; ঠিক সম্মুখ হইতে দেখিলেই উহাকে গোল দেখায়, নহিলে নয়। মনে কর হাঁসের ডিম; সরু দিকটা সুমুখে ধরিয়া দেখিলেই গোল দেখায় কিন্তু লম্বা দিকটা সুমুখে ধরিলে আর গোল দেখায় না। কিন্তু একটা ভঁাটা বা কামানের গোলা; তাকে যে দিকে যেমন করিয়া ধর গোল দেখাইবেই দেখাইবে। পৃথিবীর ও তাই। যেখানেই দাঁড়াও না কেন, চারিদিকে চাহিলেই গোলাকার দেখাইবে প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে গোল একটী রেখা দেখা যায় সেই খানে; মাঠ ও আকাশ যেন মিশিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকেই "হোরাইজন" (HORIZON) বলে। এই দৃষ্টি সীমা রেখা বা হোরাইজন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা গোলাকার। যত উপরে উঠা যায় ততই এই বৃত্ত (circle) আকারে বড় হয় কিন্তু গোলই থাকে, পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া দেখিলেও চারিদিকে ঐরূপ গোল রেখা দেখা যায়। পৃথিবীর যে স্থান হইতেই দেখ সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যাইবে। এই একটী বিশেষ প্রমাণ যে পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বা ভঁাটার মত গোল।

আরও একটী অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহাও তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। নাবিকেরা এক নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে তবে, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুনরায় আপনাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহার মধ্যে একটীবারও তাহাদিগকে দিক পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। পৃথিবী ঠিক গোল না হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না।

তার পর, আমেরিকাতে টেলিগ্রাফ্ করিলেই জানা যায় যে ঠিক যখন আমাদের দেশে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সেখানে তখন ঠিক উদয় হইতেছে; এইরূপ কেমন করিয়া হয়? আমেরিকা মহাদেশ যে আছে, তাহাতে তোমাদের সন্দেহ নাই। তবে কিরূপে ঐরূপ ঘটে? আমেরিকা ঠিক আমাদের নীচে বা বিপরীত দিকে আছে না বলিলে আর এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। নতুবা আর আমাদের দুপর বেলায় তাহাদের দুপর রাত্রি আর আমাদের রাত্রে তাদের দিন কিরূপে হইবে?

সেই রূপ চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবীর গোলাকার ছায়া যে চন্দ্রের উপরে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে তাহা তোমরা জান কিন্তু কি কারণে ওরূপ হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন। অন্য সময়ে সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু সখার পাঠক পাঠিকাগণের তাহা বোধগম্য হইবে না বলিয়া এখানে সেগুলি দেওয়া গেল না।

প্রকৃত-ঘটনা।

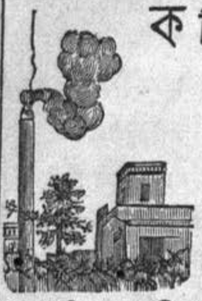

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী পরিবার বাস করিত। সেই পরিবারের এরূপ কিছু কিছু সদ্গুণ ছিল যে তাহাদের নিকটে যে কোন ঝি, চাকর থাকিত তাহারা তাহাদিগকে ভুলিতে পারিত না; তাহাদের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদের বাটীতে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। একটী পুরাতন ঝি এক দিন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদের বাটীতে আসে। সেই পরিবারের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটীর বয়স ৬ বৎসর; ঐ বালক স্বভাবতঃ বড় আলাপপ্রিয় ছিল। এমন কি যখনই তাহার পিতা মাতার কোন বন্ধু বান্ধব বাড়ীতে আসিতেন তখনই সেই বালক আপনা হইতেই তাহাদের সঙ্গে একটী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়া লইত। কাহাকে বা ছেলে, কাহাকে বা মেয়ে বলিত এবং কাহাকে বা মাসী, পীসি ও দিদি বলিয়া ডাকিত। বালকের মধুমাখা কথায় ও সুমিষ্ট আলাপে সকলেই মোহিত হইয়া যাইত। পুরাতন ঝিটী বাড়ী আসিলে বালক তাহার সহিত নানা কথায় তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিল, তখন তাহার পিতা বাড়ী ছিলেন না, মাতা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সন্তান কি আলাপ করিতেছে এবং পাছে ঐ সামান্য স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কোন অন্যায় কথা শিক্ষা করে সেই জন্য তাহার কর্ণ সেই দিকেই ছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশ অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং ক্রমে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অসুবিধা দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী অজ্ঞানতা বশতঃ বিধাতার নিন্দা করিয়া একটা কটু কথা প্রয়োগ করিল। ৬ বৎসরের বালকের সরল প্রাণে বিধাতার নিন্দা সহ হইল না; সে অতি গম্ভীর স্বরে বলিল আমরা প্রতিদিন যে দেবতার উপাসনা করি তুমি সেই দেবতাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি ত বড় দুষ্ট, ঈশ্বরকে নিন্দা! তাঁহার প্রতি কটু কথা! এইরূপ তিরস্কার করিয়াও বালক ক্ষান্ত হইল না, অমনি তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল মা দেখ ঝি কি বলিতেছে। বালকের এই সব কথায় স্ত্রীলোকটী একটু লজ্জিতা হইয়া বলিল না না আমি দেবতাকে নিন্দা করি নাই, বৃষ্টিকে বলিয়াছি। এই কথায় বালক অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল, আবার মিথ্যা কথা! প্রথমে দেবতাকে নিন্দা আবার মিথ্যা কথা! বাবা বাড়ী আসুন তোমার সব কথা বলিয়া দিব। বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী অপ্রস্তত হইয়া চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা এই বিবরণটী পাঠ করিয়া ঐ বালকের মত সৎসাহসী ও সত্যপ্রিয় হও এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

ভোলানাথের ধাঁধা।

শ্লেট খানি ল'য়ে, বসি ভোলানাথ,
কসিছেন আঁক-পাতি ;

গম্ভীর বদন, নীরব নির্জ্জন,
কাছে নাই কোন সাথী।

এক পাশে অই, অঙ্কের সে বই,
রহিয়াছে খোলা-পাতা ;
কসিছেন যাদু, কতই যতনে,
ঘেমেছে কপাল মাথা।
কত শত বার, গুণিছেন তবু,
মিলিছেনা অঙ্ক আর,
ঘরের চাতালে, মেঝের দেয়ালে,
চাহিছেন বারে বার।
গুণিছেন পুনঃ, করিয়া যতন,
তথাপিও নাহি মেলে,
এ কিরে আপদ, বিষম বিপদ,
ভাবিছেন ভোলা-ছেলে।
একবার শ্লেট, ফেলিয়া মাটিতে,
মুটো বেঁধে ধ'রে চুল,
গুণিছেন ধীরে, মনোযোগ দিয়ে,
তবু ছাই যায় ভুল !
আবার তুলিয়া, কোলেতে করিয়া,
সাবধান হ'য়ে অতি,
গুণেন যতনে, কত প্রাণপণে,
আবার যে সেই গতি !
টেনে টেনে কাণ, হ'য়ে গেল লাল,
কিছুতেই রক্ষা নাই,
মেলেনাক তবু, ছাই পোড়া আঁক
এ কিরে জঞ্জাল ভাই !
অবশেষে বাবু, করিলেন স্থির,
নিশ্চয় কেতাবে ভুল,
নহিলে কেনবা, হইবে এমন,
কেতাব (ই) অনর্থমূল !
তানয় তানয়, ওহে ভোলা ভাই,
দেখ দেখি ভাল ক'রে ?
আন দেখি বই, দেখিব এখনি,
কাহার কে ভুল ধরে ?
এই দেখ চেয়ে, পাঁচে আর ছয়ে,
কিছু তব ভেদ নাই,
সেই সে কারণে, এতই জঞ্জাল,
পড়েছ ধাঁধায় তাই !!!—

ফুলের সাজি।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

মনোরমা আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া এক-বার কাপড়খানি পরিধান করিল এবং তখন যত্নের সহিত আবার তাহা পাট করিয়া সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিল। সে সিন্ধুকে কাপড় রাখিয়া বাহিরে পিতার নিকট আসিতে না আসিতেই দেখিল রাজকুমারী হেমলতা তাহার ঘরের দিকে দ্রুতপদে আসিতেছেন। রাজকুমারীর মুখ-খানি শুকাইয়া গিয়াছে ; সর্ব্ব শরীর ভয়ে কম্পিত হইতেছে। মনোরমা মনে মনে ভাবিল এ কি ? রাজকন্যা আমাদের বাড়ীতে এলেন কেন ? এর মধ্যে এমন কি হইল। সে এই ভাবিয়া রাজ-কন্যাকে যেমন তাহাদের কুটীরে আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছে অমনি হেমলতা তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন,

মনোরমা তুমি করেছ কি? আমার মার হীরার আংটী কোথায়? তুমি ভিন্ন ত ঘরে আর কেহই ছিল না, তবে সে আংটী গেল কোথায়? শীঘ্র আংটী আমায় দেও, আমি ও মা এখন এ কথা প্রকাশ করি নাই, পাঁছে গোল হইয়া পড়ে তাই আমি নিজে খিড়্কীদোর দিয়া তোমাদের বাড়ী আসিলাম। শীঘ্র দেও, না দিলে বড় গোল বাধিবে।

মনোরমা ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে বলিল, "রাজকুমারি, দিব্য করিয়া বলিতেছি যে আমি অঙ্গুরীয় দেখি নাই। চুরির কথা দূরে থাকুক যাহা আমার নয় আমি তাহা স্পর্শ করিতেও পারি না। আমার পিতা পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই বলিয়া চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছেন।"

বৃদ্ধ দীননাথ গৃহের মধ্যে রাজকন্যাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এবং তৎপরে ঐ গোলমাল শুনিয়াই উদ্যান-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রবিষ্ট হইয়া যখন সমুদায় ঘটনা অবগত হইল তখন ভয় ও বিস্ময়ে তাহার কথা বাহির হইল না। কেবল "একি" বলিয়া চেতনাহীনের ন্যায় তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে, উত্তর করিল, "মনোরমে তুমি জান চুরি করার কি শাস্তি, চুরি করিলে রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রাজদণ্ডই ইহার প্রচুর শাস্তি নহে, অন্তর্যামী ভগবান সকল দেখিতেছেন, জানিতেছেন, তিনি পাপীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তুমি প্রলুব্ধ হইবার সময় কি আমার উপদেশ বাক্য একবারও মনে কর নাই? যদি যথার্থই তুমি অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়া থাক ত অস্বীকার করিও না, যাঁহাদের দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার দোষ মোচনের এক্ষণে ইহাই একমাত্র উপায়; দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে তোমায় রাজমহিষী ক্ষমা করিতে পারেন।"

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা আমি তোমার কাছে শপথ করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি আংটী দেখি নাই। যদি আমি পথে যাইতে যাইতে কোন জিনিস কুড়াইয়া পাই, তাহা যাহার দ্রব্য তাহাকে যতক্ষণ না দি ততক্ষণ কোন মতে সুস্থির হইতে পারি না।"

পিতা বলিল "দেখ মনোরমে, রাজকুমারী তোমায় রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ইনি তোমার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত, তোমায় এই কিছু অগ্রে কেমন চমৎকার উপহার দিয়াছেন। তোমার ইহাঁর নিকট মিথ্যা বলা কখনও উচিত নহে। তুমি তাঁহাকে প্রতারণা করিলে তোমার নিজের ঘোর অনিষ্ট হইবে। এখনও বলিতেছি নিজের অপরাধ স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজকন্যা তোমার জন্য অনুরোধ করিয়া তোমার দণ্ডবিধান মার্জ্জনা করাইবেন। আমার কথা রাখ, সত্য বল।"

মনোরমা কহিল "বাবা তুমি বেশ জান যে আমি জন্মাবধি কখন কাহারও এক কপর্দ্দক অপহরণ করি নাই, কখনও কাহার গাছের একটী ফল বা এক আঁটী ঘাসও ছিঁড়িতে ভরসা করি নাই। একটী মহামূল্য অঙ্গুরীয়ের কথা আর কি বলিব। বাবা আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি ত জান আমি কখনও তোমার কাছে মিথ্যা বলি নাই।"

দীননাথ কন্যার কথায় আশ্চর্য্য হইল বটে তথাপি বলিল "মা তোমার বৃদ্ধ পিতার মুখের

দিকে একবার চাহিয়া দেখ, আমার এই অন্তিম কালে আমায় এ দুঃখ দিও না। আমার এ দুঃখানল নিবাও, অন্তর্যামী বিধাতার নিকট অপরাধ স্বীকার কর, স্বর্গরাজ্যে অসরল মিথ্যাবাদী চোরের স্থান নাই, তিনি বর্ত্তমান, তিনি তোমার হৃদয় দেখিতেছেন, দোষ থাকে এখনও বল, আত্মাকে অধঃপাতিত করিও না।"

মনোরমা তখন করযোড়ে সকাতরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "অন্তর্যামী হরি! আমার অন্তর তুমি দেখিতেছ, আমি যে নির্দ্দোষী তাহা তুমি জান, কৃপা করিয়া আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

দীননাথ তখন কন্যা যে যথার্থ নির্দ্দোষী তাহা বেশ বুঝিল, কহিল "মনোরমে আমি বেশ বুঝিলাম তুমি আংটী চুরি কর নাই; তাহা হইলে, ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া রাজনন্দিনী ও তোমার বৃদ্ধ পিতার নিকট কখন এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। আমার আর সন্দেহ নাই, এখন আমার মন স্থির হইল। মা স্থির হও, নির্দ্দোষীর ভয় নাই। পৃথিবীতে একটি জিনিসকে আমি বড় ভয় করি সেটী পাপ। কারাবাস বা মৃত্যু ইহার কাছে কিছুই নহে। যদি পাপী না হই আর জগতের সকলে আমাদের পরিত্যাগ করে বা আমাদের বিপক্ষ হয়, তাহাতেও ভয় নাই; অভয়-দাতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। শীঘ্র বা বিলম্বে তোমার এই দোষ অলীক বলিয়া নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

রাজকন্যা হেমলতা এতক্ষণ একমনে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখ মনোরমার পিতা, আমি আপনাদের এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছি মনোরমা আংটী লয় নাই; কিন্তু ঘটনা চক্রটী ভাবিয়া দেখিলে মনোরমা ভিন্ন আর কাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। মার বেশ মনে আছে, যে মনোরমা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি আংটী বিছানার উপর রাখিয়াছিলেন, আমি ও মা, বাহিরে পরামর্শ করিতে গেলে, মনোরমা ভিন্ন সেখানে আর কেহই ছিল না। আমি পর্য্যন্তও বিছানার কাছে যাই নাই। মনোরমা ও আমি, মার ঘর হইতে বাহির হইবার পর মা যেমন আংটী পরিতে যাইবেন, আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। মা তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় ঘর দেখিলেন, খুঁজিবার সময় তিনি কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মা দুই তিনবার এইরূপে খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। এই ঘটনায় আংটী কে নিয়াছে বোধ হয়?

মনোরমার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানি না ঈশ্বর আমাদিগকে কেন এই পরীক্ষায় ফেলিলেন, তাঁহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া সকাতরে বলিল "হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার দয়া থাকিলে কোন ভয় থাকে না।

হেমলতা বলিলেন "আমার জন্মতিথির উৎসব বেশ আনন্দে হইল, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে, যাই। মা এখনও মনোরমার হিতার্থে কাহারও নিকট একটী কথাও বলেন নাই। কিন্তু আর কথা গোপন থাকে না, বাবাও অপরাহ্ণ সময়ে রাজধানী হইতে এখানে আসিবেন কথা আছে। ঐ আংটীটী তিনি আমার জন্মদিনে মাকে উপহার দিয়াছিলেন; মা আমার জন্ম

তিথির দিন আংটী পরিয়া থাকেন। আজ মার হাতে অঙ্গুরীয় না দেখিলে তখনি তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। মা মনে করিতেছেন যে, আমি মনোরমার নিকট হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া যাইব। এই বলিয়া হেমলতা চুপ করিল। গৃহ কয়েক দণ্ডের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। কিছু ক্ষণ পরে হেমলতা বলিলেন, তবে এক্ষণে বিদায়, আমি যথাসাধ্য মনোরমার দোষ কাটাইব কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিবে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া রাজকন্যা চলিয়া গেলেন, দুঃখে ও মনোকষ্টে পিতা ও কন্যা কেহই তাহার সমাদর করিতে পারিল না।

দীননাথ অধঃদৃষ্টিতে গৃহের মধ্যে বসিয়া রহিল, কষ্টে তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, মনোরমা পিতার চরণতলে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাবা, আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি না।" পিতা তাহার চিবুক ধরিয়া কহিল মা তুমি নির্দ্দোষী, অসরল পাপীরা কখন এমন সরল ও পরিষ্কার কথা কহিতে পারে না।

মনোরমা বলিল "বাবা এখন উপায় কি? না জানি আমাদের কি দশাই ঘটে। যদি কেবল আমাকেই দণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার জন্য যদি তোমায় কোন ক্লেশ পাইতে হয় তাহা হইলে আমার সহ্য হইবে না, তুমি ভাল থাকিলে বাবা আমার আর শত ক্লেশও ক্লেশ বোধ হইবে না।

দীননাথ কহিল "মা হরির চরণে পড়িয়া থাক, আকুলিত হইও না, তাঁহার ইচ্ছা বিনা কেহ আমাদের একগাছি চুলও নষ্ট করিতে পারিবে না। যাহাই কিছু সকলই তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ঘটিতেছে। এই ঘটনাও তাঁহার অভিপ্রেত—যখন তাঁহার অভিপ্রেত তখন ইহা উপযুক্ত ও শুভ ফলপ্রদ; ইচ্ছাতিরিক্ত ফল কি কখন এ জগতে সম্ভবে? অতএব, ভয় করিও না এবং কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিও না। রাজকর্ম্মচারীরা তোমায় যতই কেন ভয় প্রদর্শন করুক না, তাহারা তোমায় যতই কেন প্রলুব্ধ করুক না, তুমি সত্য হইতে কখনই একচুল বিচলিত হইও না, এবং তোমার বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিও না। তোমার বিবেক সাধু হইলে কারাগারে ক্লেশ থাকিবে না। আমাদিগকে সম্ভবত পৃথক হইতে হইবে সুতরাং আমি আর তোমায় সান্ত্বনা করিতে পারিব না; মা! এখন তুমি আমায় ছাড়িয়া জগতের যিনি পিতা সেই পরমপিতার শরণাপন্ন হও তিনি মনে সান্ত্বনা দিবেন। কেহই তোমায় তাঁহার নিকট হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইবে না।"

একি! দেখিতে দেখিতে গৃহের দ্বারে চারিজন রাজপুরুষ দেখা দিল। তাহাদের উগ্রমূর্ত্তী দেখিয়া মনোরমা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পিতার চরণ জড়াইয়া ধরিল। "ইহাদিগকে বিযুক্ত কর" এই মেয়েটাকে শিকলে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর—বৃদ্ধকে হাজত ঘরে লইয়া যাও" এই বলিয়া প্রধান রাজকর্ম্মচারী অপর রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিল, ও দীননাথের বাড়ীর চারিদিকে পাহারা নিযুক্ত করিল, কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না এবং তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হায়! কঠিন হৃদয় রাজপুরুষগণ সবলে পিতার নিকট হইতে মনোরমাকে ছাড়াইয়া লইয়া তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল, তখন তাঁহাকে

দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোরমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিন্তু নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে সেই অবস্থাতেই লইয়া গেল। মনোরমা ও তাহার পিতাকে বন্ধন করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় দলে দলে লোক আসিয়া পথের দুই পার্শ্ব ছাইয়া ফেলিল। আংটী চুরির গল্প দাবাগ্নির ন্যায় তখনই গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানা লোকে নানা কথা কহিল। নিরীহ দীননাথ ও মনোরমার দুঃখে অনেক ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তি সুখ বোধ করিল এবং তাহারা নানা বিদ্রুপ বাক্যও প্রয়োগ করিতে লাগিল। দীননাথ ও তাহার কন্যা নিজ নিজ শ্রমবলে সুখে বাস করিত তাহা দেখিয়া যে অলস ও কুমনা লোকের ঈর্ষা হইবে তার আর বিচিত্র কি? তাহাদের একজন বলিল "এখন বুঝা যাইতেছে দীননাথ কোথা হইতে এত ধন পাইয়াছে? এই জন্য ইহারা অন্য গ্রামবাসীদের অপেক্ষা বড়মানুষী করিয়া কাটাইত।" হায়! কি ভ্রম, পরিষ্কার থাকিলেই আমাদের দেশের লোক বড়মানুষী দেখে!

কিন্তু প্রসাদপুরস্থ অনেকেই তাহাদের দুঃখে যথার্থ দুঃখিত হইল এবং তাহাদের এই দশা দেখিয়া নয়ন-জল সম্বরণ করিতে পারিল না, তাহারা ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "হায়, আমাদের কি মন্দ কপাল, আমাদের একজন সৎ প্রতিবাসীর অদৃষ্টে শেষে এই ঘটিল। কেহই স্বপ্নে ইহার এই দশা ভাবে নাই। বোধ হয়, ইহারা নির্দ্দোষী। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করুন।"

তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত

ঢাকাই মসলিন্।

ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ভারতবাসীর অতিশয় গৌরবের সামগ্রী। ফরাসী ও ইংরেজগণ তাঁহাদের কলে অনেকরকম সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঢাকার প্রাচীন অধিবাসী বসাকবংশীয়দিগের হস্ত নির্ম্মিত মাকড়সার জালের মত পাতলা মসলিনের নিকট সে সকল বস্ত্র আজিও সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। শাদা, ডুরে এবং জামদানী বা ফুলদার অনেক প্রকার কাপড় বহুশতাব্দী হইতে ঢাকা নগরীতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই সকল শ্রেণীর বস্ত্রের মধ্যে একমাত্র সূক্ষ্ম শাদা মসলিনের জন্যই ঢাকার নাম পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। সুসভ্য রাজ্য মাত্রেই এ বস্ত্র আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রকাশ্য মেলা খুলা হইয়াছে সে সকল স্থানেই ইহা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে।

ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালেই ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানগণ অত্যন্ত ভোগবিলাসী জাতি। পূর্ব্বকালের মুসলমান নবাব ও বাদশাহগণের পোষাক তৈয়ারির জন্য অথবা দিল্লীর রাজসভা সাজাইবার জন্য ঢাকাই মসলিন্ বড়ই আদরের বস্ত্র ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তাঁহার পত্নী নুরজাহানের যত্নে এই ব্যবসায়ের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তখনকার তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এক খণ্ড খুব পাতলা মসলিন্ বা মল্‌মল্‌খাস ৪০০৲ টাকার কমে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের

এক গজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মল্‌মলের দাম কত? সচরাচর ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। কি আশ্চর্য্য অবনতি!! পূর্ব্বে ঢাকার বসাক বংশীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেকেই এই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন কিন্তু এখন দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের দিন দিন অবনতিতে তাঁহাদের বংশধরেরা নিরাশ হৃদয়ে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন শুনা যায় সমস্ত ঢাকার মধ্যে নবাবপুরে হরিমোহন বসাক নামে এক জন মাত্র শিল্পী আছেন যিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সক্ষম।

পুরাকালের ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায় সে কালের একটী ভাল থান লম্বাদিকে অনায়াসে একটী আংটীর মধ্যে গলিয়া যাইত। ১৬৬৬ খৃঃঅব্দে ট্র্যাভারনিয়র নামক কোন এক ভ্রমণকারী বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারস্য রাজের দূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় উটপক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটী মুক্তাখচিত নারিকেল খোলের ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটী পাগড়ীর থান পূরিয়া পারস্যরাজকে উপঢৌকন দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে ঢাকাই মসলিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের প্রচলিত নাম গুলিই বিশেষ প্রমাণ। "সওগাতি" অর্থাৎ সওগাৎ দিবার উপযুক্ত, "শরবতী" (বোধ হয় শরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন), "মল্‌মল্‌খাস" অর্থাৎ খাস মল্‌মল্‌ বা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত মল্‌মল্‌, "আব-রোআন" অর্থাৎ প্রবাহিত জল, "সব-নম" বা সান্ধ্য-শিশির এবং "বাফৎ-হাওয়া" বা হাওয়া কাপড় ইত্যাদি যতগুলি কবিত্ব পূর্ণ প্রাচীন নাম শুনা যায় এ সকল গুলিই মুসলমানগণের প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। এই বস্ত্রের গুণ এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ত স্থানে ইহা বিছাইয়া দিলে ঐ জল ও শিশিরের সহিত ইহা এমনি মিশাইয়া যায় যে হঠাৎ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না অথবা গায়ে এক খানি কাপড় থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতা হেতুই বোধ হয় নামদাতাগণ এই বস্ত্রকে কখন জল, কখন শিশির এবং কখনও বা বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানদিগের রাজ্য নাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরেজদিগের রাজ্য গ্রহণের কয়েক বৎসর পর হইতেই ভারতের এই সুন্দর বস্ত্র ব্যবসায় দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এ দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল তখন তাঁহাদের অধীনে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ভাল কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে সেই সেই স্থানে দুই একটী করিয়া কুঠী ছিল। ঐ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পীগণ কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের কারখানা সমূহে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্যান্য কারিকরদিগের হস্ত নির্ম্মিত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা করিতেন এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এতদূর প্রচলিত ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও আর আর সওদাগরগণ তখন বৎসরে প্রায় পচিশ লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মসলিন্, জামদানী প্রভৃতি) ক্রয় করিতেন। যাহা হউক এ সুখের অবস্থা বড় অধিক দিন ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া পড়ে। ১৮০৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১শত টাকার

কাপড় বিক্রয় হয় মাত্র। এখন সেই অবস্থা দিন দিন আরও এত অবনত হইয়াছে যে, আজ কাল বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকার অধিক কাপড় কাটে না।

এখন আমাদের দেশে বিলাতী কলের কাপড় এতই প্রচলিত হইয়াছে যে, দেশীয় বস্ত্র আর কেহ কিনিতে চায় না। আবার দেখ ভাল রকম দেশীয় বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয় সে সমুদয়ই প্রায় বিলাতী স্থতায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা হয়ত কখন স্থক্ষ্ম স্থতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহা ভুল কথা। হইতে পারে আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের হাড়ে হাড়ে যখন বিলাতী সভ্যতা প্রবেশ করে নাই—যখন এদেশের লোক মাত্রেই শুদ্ধ ধূতি চাদর পরিয়া বাবু সাজিত—চোগা, চাপকান, পিরান, কোট, পেণ্টুলন প্রভৃতি যখন এদেশে প্রচলিত ছিল না—তখনকার চলনসই দেশী বস্ত্রের জন্য যে সকল দেশী স্থতা ব্যবহার করা হইত তাহা আজ কালের বিলাতী স্থতার ন্যায় স্থক্ষ্ম হইত না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা আবার আরও সত্য কথা যে, এ দেশে ঢাকাই মসলিনের ন্যায় বহুমূল্য বস্ত্রের জন্য যে দেশী স্থতা বহুকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও তৈয়ার হইতেছে তাহা আবার জগতের অপর কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে না। ঢাকার আশেপাশে তন্তুবায়-শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ আস্‌না তুলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে স্থক্ষ্মতম স্থতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার নিকট ইংরেজের কলে প্রস্তুত খুব ভাল স্থতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এদেশের স্থতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার স্থক্ষ্ম স্থতার সহিত তুলনা করিয়া কাহার কিরূপ পাক, কোন্ স্থতা কত সরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু হায়! তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তুলা হইতে স্থতা ও স্থতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় দেশীয় যন্ত্র আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র দড়ি, বাঁশ, বাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি প্রভৃতি যৎসামান্য সামগ্রীতেই তৈয়ারি হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা সামান্য হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের কলের তাঁত এ দেশের তাঁতকে হারাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যায় আজ কালের ঢাকাই মসলিন্ বেশী দামী হয় না। কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? এখনকার এক তোলা আসনা তুলার স্থতার মূল্য স্থক্ষ্মতা ভেদে ৭৲ হইতে ১৮৲ টাকা। মসলিনের জন্য এক রতি ওজনের স্থতা সচরাচর ১৪০ হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহাপেক্ষাও সরু করা যাইতে পারে। আধসের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশের ও অধিক লম্বা স্থতা বাহির করা হইয়াছে। রমণীগণের কোমল হস্তে কেমন করিয়া স্থতা তৈয়ার হয় তাহা নিম্নে বলা যাইতেছেঃ—

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া তাহাতে পাতার কুচি বা মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু জড়িত থাকে তাহা খুব যত্ন করিয়া বাছিতে হয়। তারপর বোয়াল মাছের চোয়ালের দন্তপাটি দ্বারা তুলাটুকু

ঢাকাই মসলিন্ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র সমূহের নাম ও তাহাদের চিত্র।

১ম—সুতা গাঁথা।

২য়—ফেটি বাঁধা।

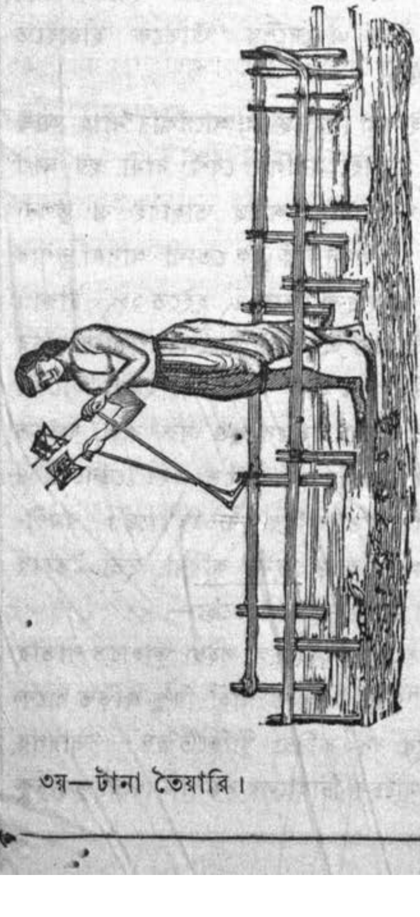

৩য়—টানা তৈয়ারি।

৪র্থ—সাঁনা বিন্ধন।

আস্তে আস্তে আঁচড়াণ হয়। বোয়াল মাছের দাঁতগুলি ছোট, ঘন ঘন ও একটু বাঁকা। ইহাতে বেশ চিরুণীর মত কাজ করে। তুলা আঁচড়াণ হইলে একখানি পাতলা চাল্‌তা কাঠের তক্তার উপর বিছাইয়া তাহার উপর দিকে একটী সরু লোহার শলা এরূপ ভাবে একবার এদিক এক-বার ওদিক করিয়া চালান হয় যে, বিচি না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহা হইতে তুলা আলাদা হইয়া পড়ে। এই তুলাকে ছোট ধনু যন্ত্রে ধুনিতে হয়। এই ধনুর জন্য তাঁত, মুগা রেশম, কলার সূতা অথবা বেতের সূতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তুলা ধুনা হইলে একটি মোটা রকম কাঠের দণ্ডে উহা আল্‌গা করিয়া জড়াইয়া অবশেষে দণ্ডটী মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তুলাপিণ্ডকে দুই খানা তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তার-পর এই তুলাকে আবার পেন কলমের মত ছোট ছোট গালামাখান শর কাটিতে জড়াইতে হয় ও সর্ব্বশেষে ঐ কাটিগুলিকে কুঁচিয়া মাছের কোমল ও মসৃণ ছালে ঢাকিয়া রাখা হয়। এক একটী গালার কাটি জড়ান তুলাকে "পুনী" বলে। ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে সূতা কাটিবার সময় কোন রকম ময়লা ধরে না।

তুলা হইতে কেমন করিয়া সূতা কাটিতে হয় তাহা প্রথম চিত্রে দেখান গেল। ৩০ বৎসরের অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া থাকেন। শুষ্ক বায়ু ও উত্তাপের সময় তুলার আঁইশ টানিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়, এজন্য শীতকালে সকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে বেলা ১০টা এবং অপরাহ্নে ৩।৪টা হইতে সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল সূতা কাটিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু অধিক দামী সূতা সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ঘাসের উপর শিশির থাকিতে থাকিতে প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন বায়ুর শুষ্কতা নিবারণের একটী সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। একটী প্রশস্ত জলপাত্র নিম্নদেশে রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হয়। তাহা হইলে জল হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা দ্বারা তুলাকে কতকটা নরম রাখে। সূতা কাটিবার জন্য এই কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক। ১ম "পুনী", ইহার কথা উপরে বলা গিয়াছে। (২য়) মোটা সূঁচের মত একটা ১০ হইতে ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার "টেকো"। ইহার নিচের দিকে একটু উপরে একটী মাটির ছোট গোলাকার বর্ত্তুল বা চক্র থাকে। এরূপ ভারি জিনিস তলায় না থাকিলে টেকোটী কখনই একবার মাত্র হাতে করিয়া ঘুরাইয়া দিলে কিয়ৎকাল উহা আপনি আপনি ঘুরিত না। (৩য়) একখণ্ড শাঁক। ইহার উপরদিকটী মাটির দ্বারা ঢাকা। টেকো ঘুরাইবার সময় এই শাঁকের উপর তাহার নিম্ন ভাগটী রাখা হয়। (৪র্থ) ছোট একটা পাথর বাটি। এই বাটিতে খড়ির গুড়া থাকে। হাত যাহাতে তেলা না হয় তজ্জন্য বারবার এই খড়ির গুড়া হাতে লাগান হয়।

দ্বিতীয় চিত্রে নাটাইয়ে করিয়া সূতার ফেটি বান্ধা, তৃতীয় চিত্রে কাপড়ের টানার জন্য সূতা তৈয়ারি করা ও চতুর্থ চিত্রে সানার ভিতর সূতা পরান প্রভৃতি দেখান গেল। এ সকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আর কয়েকটী চিত্র আমরা পরে দিব।

স্থানাভাব বশতঃ এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।

সখা
চতুর্থ ভাগ। নবম সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সখার পাঠক পাঠিকা! আজ আবার আমাদের দেশের একটী বড় লোকের মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। যে সকল লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দুঃখের বিষয় ইহাঁর একখানি ছবি তোমাদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। ইহাঁকে মধ্যে মধ্যে ফটোগ্রাফ অর্থাৎ ছবি-মুদ্রাকরদিগের বাড়ীতে গিয়া ছবি তুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু ইনি নিজের নাম বা কীর্ত্তি রাখা বিষয়ে এত উদাসীন ছিলেন যে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতেন না। তাঁহার চিরজীবনে এই ভাব ছিল, তিনি যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছেন তাহা গোপনেই করিয়াছেন।

ইহাঁর নাম পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তোমরা "সোমপ্রকাশ" নামক খবরের কাগজের বিষয় শুনিয়া থাকিবে অথবা তাহা দেখিয়া থাকিবে, ইনি তাহার সম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর জীবনচরিত বিষয়ে কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বলিব। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা নামক গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি কলিকাতার পুরাতন বাঙ্গালা পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৃত্তি দ্বারাও অনেক উপার্জ্জন হইত। ইহাঁর পিতা একজন অতিশয় সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন লোক ছিলেন। যতকাল জীবিত ছিলেন নিজ বাসাতে স্বগ্রামের ও জ্ঞাতি কুটুম্বের অনেকগুলি ছেলে রাখিয়া মানুষ করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে অনেকে এখন কৃতী হইয়া সংসারে করিয়া খাইতেছেন। তিনি সদ্বিবেচক ধীর ও সংসার পালনে পরিপক্ক লোক ছিলেন; তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ ও তাঁহার প্রতিবাসিগণ অনেক শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা গুণে সে সমুদায় কাটিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পিতার ধীরতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, ও মিতব্যয়িতা প্রচুর পরি-

মাণে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহা পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কথা হইবে। সে সময়ে এই কলিকাতা সহরে যে সকল বালক বাস করিত তাহাদের পক্ষে অনেক বিপদ ছিল, ঈশ্বরকৃপায় সে সকল বিপদ এখন নাই। তখনকার নীতির বাতাস দূষিত ছিল, অনেক পাপকে যুবকগণ পাপ বলিয়া মনে করিত না। লোকের রুচি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল, সাহিত্যের অবস্থা অতিশয় হীন ছিল; বর্ত্তমান সময়ে তোমরা কত ভাল ভাল গ্রন্থ পড়িতে পাইতেছ ইহার কিছুই তখন ছিল না। সুতরাং সে সময়ে যাহারা ভাল থাকিয়াছেন, আপনাদের চরিত্র সৎ রাখিয়া নিজের উন্নতি করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার পাত্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ লোক ছিলেন। তিনি বালক কাল হইতে অনেক প্রকার পাপের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে কিছুদিন তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে শিক্ষকতা কার্য্য করেন তৎপরে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে ঐ কালেজের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষক অতি অল্পই ছিল। জল হউক, ঝড় হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথা সময়ে স্বস্থানে উপস্থিত আছেন। শ্রমশীলতা ও সুনিয়মের গুণে দীর্ঘকাল তাঁহার স্বাস্থ্য এমন সুন্দর ছিল যে তাঁহাকে ২৫ বৎসরের মধ্যে ২৫ দিন বিদ্যালয় হইতে ছুটী লইতে হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

তাঁহার জ্ঞানানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছিলেন। সে সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরাজি শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। তদনুসারে তিনি বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখেন নাই কিন্তু তিনি অতিশয় পরিশ্রমের সহিত বাড়ীতে ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজী উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী বলা বা লেখা অভ্যাস ছিল না কিন্তু ঐ ভাষায় ভাল ভাল অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান চর্চ্চাতে নিযুক্ত ছিলেন।

গাম্ভীর্য্য তাঁহার মনের স্বাভাবিক ভাব ছিল। বালক কাল হইতেই তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিতেন না। গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস, জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রভৃতি গাম্ভীর্য্য রস পূর্ণ গ্রন্থই পড়িতে ভাল বাসিতেন। হাল্‌কা বিষয় পড়িতে তৃপ্তি পাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি এমনি গম্ভীর ছিল যে বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত সহসা তাঁহার সমীপে যাইতে সাহসী হইত না। তাঁহার প্রকৃতি রূঢ় বা কর্কশ ছিল না, এমন কি তাহার বয়ঃ-প্রাপ্ত পুত্রদিগকে কখনও তুই বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনা যায় নাই, অথচ, কেহ সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। তিনি যখন নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন তখন তাঁহার মাতাও হঠাৎ গিয়া কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। বড় লোকের মা বড় হইয়া থাকেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতা অতিশয় উদার-হৃদয়া রমণী ছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চরিত্রের আর একটী গুণ ছিল, ন্যায়পরতা। নিজে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিতেন এবং অপরেও তাহাদের স্বীয় স্বীয় দেয় কড়ায় গণ্ডায় দেন এই ইচ্ছা করিতেন এবং সে বিষয়ে ত্রুটী

দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ম্মে মনোযোগী তিনি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং যথা সাধ্য তাহাদের উন্নতি করিতেন, কিন্তু যাহারা কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন তাহারা অতি নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন না ও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। কেহ অপরের প্রতি অন্যায় করিতেছে দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময় দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া অন্যায়-কারীর দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার তাঁহার প্রতিবেশিনী একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকের কিছু জমি কাড়িয়া লইবার জন্য একঘর ধনীলোক প্রয়াস পায়। স্ত্রীলোকটীর সহিত বিবাদ হওয়াতে তাহারা কয়েকজনে একদিন তাহাকে প্রহার ও অপমান করিবার জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আচরণের বিষয় শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন এমন সময়ে ঐ বিধবার পুত্রটী ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বড় বাবু আমার মাকে কয়জনে ঘরে ঢুকিয়া মারিতেছে।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় শুনিবামাত্র নিজ কনিষ্ঠকে ডাকিয়া লইয়া ঐ বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সেখানে পৌছিয়া নিজ সহোদরকে ঐ দুর্বৃত্তদিগকে সমুচিত প্রহার করিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে বোধহয় রাজদ্বারেও তাহা-দিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ অন্যায়-কারীর প্রতি বিরাগ থাকাতে অনেক লোকের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা হইত। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে শাস্তি দিতেন তাহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ধনীদিগের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে বৃত্তি পান, তাহা লওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকদিগের নামে যে সকল বৃত্তি আসিত তাহাতে তাঁহার যে অংশ থাকিত তাহা তিনি লইতেন না। এরূপ শুনিয়াছি একবার বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী হইতে কিম্বা অন্য কোন মহাবিভবশালী ব্যক্তির বাড়ী হইতে অনেকগুলি মূল্যবান দ্রব্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সেই সমুদায় মূল্যবান বস্তু রাখিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, তিনি কোন মতেই রাখিতে দিলেন না, সেই সমুদায় দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকবার অনেক প্রকারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। কেবলমাত্র সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত কয়েক সহস্র মুদ্রা লইয়াছিলেন। অন্যায় কার্য্যকে তিনি বিষের ন্যায় দেখিতেন।

তাঁহার আর একটী গুণ ছিল শ্রমশীলতা। রাত্রি ১১ টা ১২ টা বাজিয়া গিয়াছে, পরিবার পরিজন সকলেই নিদ্রিত তখনও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যয়ন করিতেছেন। আবার প্রাতে রাত্রি ৪টা হইতেই তাহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উঠিয়া লিখিতেছেন। তিনি যতদিন সুস্থ ও সবল ছিলেন, ৪ চারি ঘণ্টার অধিক কাল কখনই নিদ্রা যান নাই। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন;

প্রথমে পুত্র কন্যাদিগকে তুলিতেন তৎপরে ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিয়া জাগাইতেন। সকলকে না তুলিয়া নীচে নামিয়া আসিতেন না। আলস্য তিনি দেখিতে পারিতেন না—অলস ও অকর্ম্মণ্য লোককে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, চোর ডাকাতকে তত ঘৃণা করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন—"উদ্যোগিনং পুরুষ কি মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" উদ্যোগশীল পুরুষকেই লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। যাহার উদ্যোগ নাই, কর্ম্মশীলতা নাই, সে সংসারে লক্ষ্মীছাড়া হয়।

চতুর্থ সদ্‌গুণ ছিল স্বাধীন-চিত্ততা। তাঁহার কাপুরুষতা ছিল না। নিজের শ্রম ও চেষ্টাতেই উন্নতি করিব এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল ছিল। জীবনে কখনও কাহারও তোষামোদ করেন নাই। বড় বড় ধনীর শত্রুতা দেখিয়া একদিনের জন্য ভীত হন নাই; সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কর্ত্তব্য পালনে একদিন পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। স্বীয় গ্রামে একটী ভাল ইংরাজী স্কুল থাকে, এই ইচ্ছাতে তিনি প্রথমে একজন ধনীর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ধনীর তত্বাবধানস্থিত একটী স্কুলের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে দেখিলেন যে সেখানে স্বাধীন ভাবে স্কুলের উন্নতি করা দুষ্কর; সে স্কুলটী ভাল হইবার নহে। তখন নিজে একটী উৎকৃষ্টদরের ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাতে গ্রামের ধনীদিগের অনেকে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইলেন, কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থার গুণে উক্ত স্কুলটীকে একটী প্রথম শ্রেণীর স্কুল করিয়া তুলিলেন। সে জন্য মাসে মাসে অনেকগুলি অর্থ দিতে হইত। ঐ স্কুলটীর দ্বারায় তাঁহার গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের যে কত উপকার হইয়াছে তাহার বর্ণনা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের কুলীনদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে কোন গৃহস্থের গৃহে কন্যা সন্তান জন্মিবামাত্র একটী পাত্র দেখিয়া তাহার বাগ্‌দান করা হয়। অনেক সময়ে তিন মাসের বালিকা ও চারিমাসের বালকে সম্বন্ধ করা হয়; ইহাতে অনেক অনিষ্ট হয়। এই জন্য দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ চির দরিদ্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য অনেক লিখিয়াছিলেন ও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে আপনার পুত্র কন্যাগণের নিতান্ত শৈশবে বাগ্‌দান করিতে দেন নাই। তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে এখন দাক্ষিণাত্য বৈদিক গণের মধ্যে অনেকে এই কুৎসিত প্রথা ভগ্ন করিতেছেন।

এই সকল গুণে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—সোমপ্রকাশ। এই সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এদেশে সংবাদপত্রের পুনর্জন্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে দুই একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল তাহাতে কেবল কবিতা ও ছড়া ও লোকের গালাগালি প্রকাশ হইত। তিনি প্রথমে এদেশের লোককে গম্ভীর ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখাইলেন। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন পরিশ্রমে সমর্থ ছিলেন তখন সোমপ্রকাশ সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার মতামত মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন, লোকেও ইহার মত কি জানিবার জন্য উৎসুক থাকিত। গত দশ বার

বৎসর ইহাঁর বার্দ্ধক্য ও শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন সোমপ্রকাশের আর সে দশা নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের জন্মদাতা। এজন্য এদেশের লোক চিরদিন ইহাঁর নিকট ঋণী থাকিবেন। ইনি কিছুদিন হইল পীড়িত হইয়া জব্বলপুরের সন্নিহিত সাতনা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সেখানে গত ৮ই ভাদ্র সোমবার, বিস্ফোটকরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভাই বোন্।

(ঘুমপাড়াইবার সঙ্গীত।)

১

ঘুম যাও ভাই খোকন বাবু সোণার যাদুমণি,
ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে! দিব ছানা ননী;
আসবি যদি মণির চোখে,
কত ভাল বাস্‌ব তোকে
হীরের বালা মুক্তা মালা করব্ কত দান
বাটি ভ'রে দুদ খাওয়া'ব বাটা ভ'রে পান।

২

ঘুম যাও ভাই খোকন বাবু আমার নয়নতারা,
তাদের চোখে ঘুম এসে না "মন্দ খোকা" যারা;
তুমি যে ভাই শান্ত সোণা,
সোণার চাঁদটী চাঁদের কণা,
সকাল সকাল ঘুমাও যাদু জাগ সকাল বেলা,
তাইতে আমি তোমার সনে সদাই করি খেলা।

৩

আকাশ মাঝে ঘুম পড়েছে সাঁজের তারাগুলি
ফুল বাগানে ঘুমায় যত ফুলের নবীন কলি
এদের, ওদের, তাদের ঘরে,
পড়েছে সব ঘুমের ঘোরে
গাছে গাছে ঘুম গিয়েছে কোমল কচিপাতা
আমার যাদু ঘুম পড়ে না একি লাজের কথা!

৪

ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে! দিব মিঠাই খেতে
বসে' যা মোর মণির চোখে সোণার আসন পেতে
খোক্‌না বড় দুষ্ট ছেলে,
শান্ত হবে তোমায় পেলে,
তোমার ও মুখ মিষ্ট মাখা, তাইতে বাসে ভাল
হাস্‌বে কত, স্বপন ছলে ঘর করিয়া আলো।

৫

ঘুম পড় ভাই সোণার গোপাল ঘুম পড় মোর বুকে
মা আসিয়ে কোলে নিয়ে চুম দেবেন মুখে
যখন হবে সকাল বেলা,
তখন দুজন কর্‌ব খেলা
এখন আমার লক্ষ্মী ছেলে এই কথাটী শোন
ঘুম পড় মোর সোণার মাণিক ঘর উজলা ধন।

ঢাকাই মস্‌লিন।

গতবারে এই মস্‌লিন কাপড় বুনিবার যে ৪টা যন্ত্রের চিত্র দেখাইয়াছি তাহার প্রথমটী ছাড়া আর কোনটীর বিবরণ ভাল করিয়া দেওয়া হয় নাই। আজ আমরা তাহাদের কথা লিখিতেছি।

২য় চিত্র। স্ত্রীলোকগণ সূতা কাটিয়া তাঁতিদিগকে দিলে পর তাঁতিরা তাহা হইতে কেমন করিয়া নলী পাকায় ও ফেটি বাঁধে তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। নল হইতেই নলী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নলী পাকান কি জান? কতকগুলি ফাঁপা কঞ্চি কাটি ৪ ইঞ্চি আন্দাজ টুকরার আকারে কাটিয়া তাহাতে এক এক ফেটির সূতা জড়ান হয়। এইরূপ সূতা জড়ান এক একটা নলকেই নলী বলা হয়। নলীর গর্ত্তে একটা সরু কাটি পুরিয়া ঐ কাটির দুই প্রান্ত একখানা চেরা বাখারির অগ্রভাগে লাগাইয়া দিলে গাড়ির চাকার মত নলীটা ঘুরিতে থাকে। যে বাখারিতে নলীটা লাগাইয়া দেওয়া হয় উহা তাঁতি বাম পদের অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরে। তাঁতির ডান হাতে এক খানা ফেটি জড়াইবার নাটাই থাকে; নাটাইয়ের বাঁটের নিম্ন ভাগটা এক খণ্ড নারিকেল খোলের উপর ঘুরিতে থাকে ঐ খোলটা তাঁতির ডান পায়ের আঙ্গুলের ঠেসে স্থির থাকে। একটা নলীর সমস্ত সূতা নাটাইয়ে জড়াইয়া লইলে উহা নাটাই হইতে উঠাইয়া ছোট ছোট ফেটি বান্ধা হয়।

সমস্ত সূতাকে প্রধানতঃ টানা ও পোড়েন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। টানা অপেক্ষা পোড়েনের সূতা সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। এই পোড়েনের সূতা আবার তিনরূপে বাছাই করা হয়। ভাল সূতা গুলি ডান হাতের দিকে, মাঝারি গুলি বাম হাতের দিকে এবং খেলো বা মোটাগুলি মাঝখানে দেওয়া হয়। আমাদের দেশী কাপড় মাত্রেই যে মুখপাতের দিকে ভাল ও পিছনের দিকে খারাপ কেন হয় তাহা এখন বেশ বুঝলে ত?

টানা ও পোড়েনের সূতা ঠিক্ এক সময়ে বা একই নিয়মে তৈয়ার করা হয় না। পোড়েনের সূতা যেমন কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই চলে, টানার সূতা সেরূপ নয়। ইহা তৈয়ার করিতে অনেক সময় দরকার; এই সূতা তৈয়ারির কথা বিস্তৃত রূপে বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। আমরা মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজাইতে হয়। চতুর্থ দিনে সূতাকে বেশ করিয়া ধুইয়া ২য় চিত্রে প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ফেটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয় এবং দুইটা কাটির দ্বারা ঐ ফেটির সূতাটুকু খুব পাক দিয়া জড়াইয়া রৌদ্রে শুকান হয়। তারপর সূতাগুলিকে আবার দুই দিনের জন্য কয়লার গুড়া বা ভূষা মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখা হয় ও দুই দিনের পর পরিস্কার জলে ধুইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। এই সময় সূতাকে আবার একবার নাটাইয়ে পাকাইয়া আবার এক রাত্রির মত জলে ভিজাইতে হয় ও পরদিন খইয়ের মাড়ের সহিত খানিকটা পরিস্কার চূণ ও জল মিশাইয়া এক রকম মণ্ড তৈয়ার করিয়া সূতা গুলিতে উত্তমরূপে মাখান হয়।

তার পর ঐ মণ্ড মাখা সূতাকে নাটাইয়ে জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। একগাছি সূতার উপর আর একগাছি সূতা পড়িলে পাছে পরস্পরে জড়াইয়া যায় এই জন্য মাড় দেওয়া সূতা নাটাইয়ে জড়াইবার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার। যেন এক এক ফের সূতা আলাদা আলাদা থাকে। মাড় মাখা সূতা বেশ শুকাইয়া গেলে আর একবার মাত্র নাটাইয়ে পাকাইয়া লইলেই টানার সূতা তৈয়ার হয়। কিন্তু আমরা যে সূতার কথা বলিলাম ইহা কেবল সাদা থান বুনিবার জন্যই দরকার হয়। "ডুরে" কিম্বা "চারখানা" কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র নিয়মের দরকার। সাদা কাপড়ের জন্য যেমন একগাছি মাত্র সূতা পাট করা হয়; তাহা না করিয়া ডুরের জন্য দুই গাছি সূতা ও চারখানার জন্য চারিগাছি সূতা একত্রে জড়ান ও উপরোক্ত নিয়মে পাইট করা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বস্ত্র মাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন যে অধিক টেঁকে তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের তাঁতিরা সূতাকে রীতিমত পাইট করে বলিয়া। ঢাকাই মস্‌লিনের সূতার যেমন পাইট দরকার তেমন পাইট অবশ্য আর কোন কাপড়ের জন্য দরকার করে না তথাচ একথা ঠিক যে আমাদের দেশে যেরূপ যত্ন করিয়া বার বার সূতা পাকান হয় ও তাহাতে মাড় মাখাইয়া শক্ত করা হয়, সে রূপ না করিলে দেশী কাপড় কখনই টেঁকসই হইত না। আবার দেখ, সূতা বেশ করিয়া পাইট করিলে শুদ্ধ যে তাহা শক্ত হয় তাহা নয় কিন্তু সরুও হইয়া থাকে। ঢাকাই তাঁতিরা এতদূর ওস্তাদ যে ৩০০ নম্বর বিলাতি সূতাকে পাইট করিয়া ঠিক ৪০০ নম্বরের সূতার মত করিয়া দিতে পারে। যে কাপড়ের সূতা ধোপে কম ফুলে বা ফাঁপিয়া উঠে তাহাই অধিক দিন স্থায়ী হয়। আমাদের দেশী তাঁতিরা যে সূতা তৈয়ার করে তাহা বেশ পাক খায় বলিয়া ধোপে এলাইয়া যায় না। ইহাই আমাদের দেশী কাপড়ের বেশী টেঁকসই হইবার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

পোড়েনের সূতা কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই কেন চলে জান? কারণ টানার সূতার মত পোড়েনের সূতা একবারে তৈয়ার করা দরকার করে না। ইহার পাইটও অনেক কম এমন কি ইহাতে যে মাড় লাগান হয় তাহাও অল্প। একদিন বুনিবার মত খানিকটা সূতা লইয়া ২৪ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে নাটাইয়ে পাকাইয়া ও অল্প করিয়া মাড় মাখাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই হইল। এইরূপে পোড়েনের সূতা একেবারে তৈয়ার না করিয়া প্রত্যহ একদিনের বুনিবার মত খানিকটা করিয়া সূতা প্রস্তুত করিলেই চলে।

৩য় চিত্র। টানার সূতা তৈয়ারি হইলে পর এক প্রশস্থ জায়গায় গিয়া উহা বিস্তার করিয়া তাঁতিরা কাপড়ের থান যত বড় হইবে সেই মাপ অনুসারে দুই সারি গোঁজ পুতিয়া তাহাদের গায়ে লম্বাভাবে সূতা বিছাইতে থাকে। দুইটী লাইন সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ এক লাইন হইতে অপর লাইনের ফাঁক, কোথাও কম বেশী হয় না যেন সব জায়গায় সমান হয়। কাটি পোঁতা হইলে তাঁতিরা দুইহাতে দুইখানি নাটাই লইয়া উহার উপর সূতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। মনে কর যদি খোঁটার লাইন দুটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয় তাহা

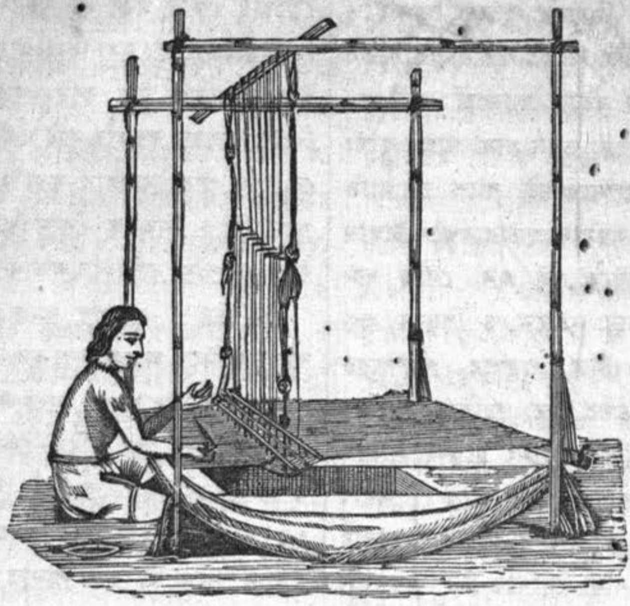

৫ম চিত্র।

৬ষ্ঠ চিত্র।

হইলে প্রথমে যদি পশ্চিম ধারের লাইনের উত্তর সীমা হইতে তাঁতি চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যখন সে ঐ লাইনের দক্ষিণ সীমায় যায় তখন তাহাকে একটু পূর্ব্ব মুখ হইয়া পূর্ব্ব লাইনের দক্ষিণ সীমার খোঁটার কাছে যাইয়া আবার উত্তর মুখ হইয়া বরাবর পূর্ব্ব লাইনের উত্তর সীমায় আসিতে হয়। দুইটী লাইনে এইরূপে যখন একবারস্থতা বিছান হয় তখন আবার তাহাকে পূর্ব্বদিকের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম লাইনের উত্তর প্রান্তে আসিতে হয়। এইরূপ বারবার যাওয়া আসা করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে "টানা হাঁটা" বলিয়া থাকেন। একখানি কাপড়ের বহরে যতগুলি স্থতা বসান দরকার ঠিক ততবার "টানা হাঁটা" আবশ্যক।

৪র্থ চিত্র। টানার স্থতা বিছান হইলেই প্রায় উহা সানায় চড়ান হয়। কোন কোন স্থলে কেবল ঐ স্থতা তাঁতের গোল দণ্ডে প্রথমতঃ জড়াইয়া তারপর সানায় চড়ান হয়। সানায় স্থতা চড়াইবার সময় প্রথমতঃ স্থতা

গুলিকে সাবধানের সহিত গোল করিয়া গুটাইয়া চালার আড়কাটের নিম্নদেশ হইতে ঝুলাইতে হয়। এইরূপ ঝুলাইয়া দিলেই সূতার একদিকের মুখগুলি যখন জমি হইতে আন্দাজ ১ ফুট ১।৷০ ফুট উচ্চে আসিয়া পড়ে, তখন সানা গাঁথা কার্য্য আরম্ভ হয়। সানা খানিকে দুই পাশে দুই গাছি দড়ির দ্বারা বান্ধিয়া লম্বমান সূতার সম্মুখে টাঙ্গান হয়। সানার দুইদিকে দুই জন লোক দরকার। অর্থাৎ সূতার সামনে ও পিছনে এক এক জন লোক বসিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সানার ভিতর সূতা পরাইতে থাকে। ১৮ গিরা বা ৪০॥ ইঞ্চি একখানা ঢাকাই সানায় শুনা যায় ২৮০০ পর্য্যন্ত খাঁজ থাকে। অর্থাৎ এক ইঞ্চির মধ্যে ৭০টী খাঁজ বা সূতা পরাইবার জায়গা। একখানা সানা দেখিতে ঠিক একখানি লম্বা সরু চিরুণীর মত। তবে চিরুণীর এক মুখ ফাঁক ইহার দুই মুখই বন্ধ। বাখারিকে খুব মিহি সুঁচের মত করিয়া চাঁচিয়া ও এক সমান করিয়া দুই ধারে দুই গাছি বেতের মধ্যে শক্ত করিয়া লাগাইয়া সানা তৈয়ার করা হয়। এই সরু কাটিগুলির মাঝে মাঝে যতগুলি ফাঁক থাকে তাহার প্রত্যেকে সূতা পরানর নামই সানা বিন্ধন। সানায় যতগুলি খাঁজ থাকে সেই মত সানার নাম দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোন সানায় ২৮০০ খাঁজ থাকিলে তাহাকে ২৮ শর সানা, ২৬০০ খাঁজ থাকিলে ২৬ শর সানা বলা হয় ইত্যাদি। সানায় সূতা পরান হইলে পর উহা বেশ সাবধান পূর্ব্বক তাঁতের দণ্ডে জড়াইতে হয়।

৫ম চিত্র। ইহার পর কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে জমির উপর দুই প্রান্ত সমান উচ্চ করিয়া একবার সূতা গুলিকে বিস্তার করা হয়। এই সময়ে তাঁতির সুবিধা মত কোথায় কিরূপ চিহ্ন দরকার, কোথায় কোন ফাঁস ও বন্ধনের আবশ্যক এবং কি উপায়ে সূতার মধ্য দিয়া মাকু চলিতে পারে ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিয়া লয়। এসব কথা বিস্তৃত বলিবার দরকার নাই। চিহ্ন করিবার জন্য যে লাল সূতা ব্যবহার করা হয় উহা তাঁতির পশ্চাৎদিকে নিকটস্থ কোন একটী খুঁটির গায়ে বাঁধা একখানা নাটাইয়ে জড়ান থাকে।

৬ষ্ঠ চিত্র। এইরূপে সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ হইলে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করা হয়। তাঁতিরা কেমন করিয়া তাহাদের চালার মধ্যে তাঁত খাটায় তাহা এই চিত্রে বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখান হইল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্রের দুই দিকে দুইটী করিয়া যে গোল দণ্ড দেখিতেছ ইহার মধ্যে পিছনের দণ্ডটীতে সূতা জড়ান থাকে ঐ সূতা সানার মধ্য দিয়া সম্মুখের দণ্ড পর্য্যন্ত ছড়ান থাকে। তাঁতি যখন সম্মুখ দিক হইতে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে তখন সম্মুখের দণ্ডতেই একটু একটু করিয়া কাপড় জড়ান হয় এবং পিছনের দণ্ড হইতে ক্রমেই সূতা ফুরাইয়া আইসে। আমাদের তাঁতিরা যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র বুনে তাহা আমাদের পাঠক বর্গের অনেকেই দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঢাকাই মস্‌লিনের যন্ত্রাদি দেখিয়া এবং হিন্দু তাঁতির ক্ষীণ শরীর অথচ অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, দক্ষতা ও অঙ্গুলি চালনা দেখিয়া ইংরেজেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন "ভারতবাসীরা যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে এ সূক্ষ্ম কাপড় বুনিয়া থাকে ইয়ুরোপীয়দিগের কদাকার অঙ্গুলিতে সে সকলের সাহায্যে মোটা ক্যানভাস কাপড়ও তৈয়ার হইতে পারে কিনা সন্দেহ।" উত্তাপের সময় তাঁতিরা মসলিন্ কাপড় বুনিতে পারে না। ভাল কাপড় মাত্রেই সকালে বৈকালে বুনা হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র

এই তিন মাসই খুব ভাল মস্‌লিন বুনিবার উপযুক্ত সময়।

ক্রমশঃ

সাধের খেলা।

বোসেদের দুটি ছেলে সদাই খেলায় মন,
লেখা পড়া ছেড়ে শুধু খেলাতেই প্রাণপণ।
পূজার ছুটিটি হলে খেলিবে কতই খেলা,
পড়া ছেড়ে সেই ফন্দি আঁটিতেছে এই বেলা।
ছুটিতে খেলিবে ব'লে মিলে তিন ভাই বোনে
বাবা তাহাদের এক দিয়েছেন গাড়ী কিনে।
কবে বা হইবে ছুটি, বিলম্ব না সহে আর,
বড় সাধ গাড়ী লয়ে খেলে আজই একবার।
দেখিল উভয়ে হর্ষে, বাবা আজ নাই ঘরে,
সুরেশ সুযোগ দেখে ডেকে বলে নরেশেরে।
সরলারে ডেকে আন্, বাবা আজ বাড়ী নাই,
গাড়ীতে চড়ায়ে তারে চল্‌রে খেলিতে যাই।
নরেশ উঠিল নেচে ; বাবা আজ বাড়ী নাই।
সরলারে ডেকে নিয়ে চল ভাই চল ভাই।
গাড়ীখানি লয়ে গেল যেখানে সরলা আছে,
দুই ভাই মিলে তবে বল্লে সরলার কাছে।
দেখ্ বোন দুই ভাই নূতন পোষাক পরে,
আসিয়াছি তোরে ল'য়ে খেলাতে যাবার তরে।
তুইও বোন তোর সেই নূতন পোষাক পরে,
টুপিটি মাথায় দিয়ে হাতেতে ছাতিটি ধরে,
চল্ বোন চল্ বোন, বাবা আজ নাই বাড়ী,
আনিয়াছি এই দেখ্ কেমন সুন্দর গাড়ী।
তোমারে চড়ায়ে তাতে টানিব দুজনে মোরা,
দুইজনে ছুটে যাব যেন দুই জুড়ি ঘোড়া।
চল বোন চল তবে বিলম্ব ক'রোনা আর,
বাবা বাড়ী এলে পরে যাওয়া যে হইবে ভার।
ভাইদের কথা শুনে আনন্দে উঠিল নেচে,
নূতন পোষাক পরে সরলাও এল সেজে।

ছাতিটি লইয়া হাতে গাড়ীতে উঠিয়া বসে
আনন্দে দুভাই ছুটে দড়ি লয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
এইরূপে কতদূর
চলিল কজনে তারা

কতই উৎসাহ আজ প্রাণে ;
আনন্দে চলিছে ছুটে
কোন দিকে দৃষ্টি নাই
বিঘ্ন বাধা কিছু নাহি মানে।
আছিল পথেতে সেই
বৃহৎ পাথর এক
দুজনার কেহ না দেখিল,
হঠাৎ সে পাথরেতে
বিষম আঘাৎ লেগে
দড়িগাছ অমনি ছিড়িল।
সুরেশ পড়িল নীচে, নরেশ পড়িল তদুপরি,
গাড়ীখানি উল্টে গিয়ে সরলাও যান গড়াগড়ী।

অতলস্পর্শ।

অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ৭।৮ বৎসর হইবে, আমি একবার পূর্ব্বাঞ্চলে কোন স্থানে ছিলাম। তখন বর্ষাকাল; আমাদের পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁদের একটু অভিমান বেশী তাঁদের মত আকাশের মুখখানি সকল সময় ভার হইয়াই থাকিত, ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ সারা দিনই বৃষ্টি হইত, কাজেই বড়একটা বাড়ীর বাহির হইতে পারিতাম না, সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকিতে হইত। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন চারিদিক আঁধারে ছাইয়া আছে, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, তখন মনের মধ্যে কত রকম চিন্তা, কত রকম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; সকলেরই হয় কিনা জানি না, কিন্তু আমার হয়। আর শুনিয়াছি সেই ভাব গুলি যাঁহারা প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাই কবি। শুনিয়া আমারও একটু কবি হইবার

ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব এমনি চঞ্চল ও অস্থির যে শত চেষ্টা করিয়াও আমি সেগুলিকে ধরিয়া নিজের বশ করিতে পারিতাম না; কাজেই অনেক চেষ্টার পর কবি হইবার ইচ্ছাটী আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। সে কথা যাক্, বলিতেছিলাম যে একদিন বিকাল বেলা একটি ঘরে একলা বসিয়া কত কি ভাবিতেছি এমন সময় কামানের শব্দের মত এক প্রকার গভীর শব্দ হঠাৎ শুনিতে পাইলাম; বোধ হয় ক্রমান্বয়ে ৬।৭ বার শব্দটী হইল। সেখানে কামানের শব্দ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অথচ কোথা হইতে এমন ভয়ানক শব্দ আসিতেছে জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম। শব্দটী শুনিয়াই আমার মন কেমন এক প্রকার ভয় ও বিস্ময়ের ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিতে ভাবিতে একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার প্রাচীন বয়স, তিনি বলিলেন, ও আর কিছু নয়, যমের বাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ। তাঁহার কথায় আমার মনের ভয়ের ভাবটা একটু বেশী হইল বটে, কিন্তু কেন জানি না কথাটায় বড় বিশ্বাস হইল না; যাহা হউক, তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সেই অবধি প্রায়ই ঐ শব্দ শুনিতে পাইতাম, আর শুনিলেই কত চিন্তা আসিত। এ শব্দটা কোথা হইতে আসে জানিবার জন্য আমার ভারি একটা আগ্রহ জন্মিল এবং অনেকের কাছে অনুসন্ধানও করিতে লাগিলাম। এ সম্বন্ধে এখনও স্থির কিছু জানা যায় নাই, তবে কতক জানা গিয়াছে। যাহা জানা গিয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর, এবং তাহাতে বড় ভয়েরও কথা আছে।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের বরিশাল অঞ্চলে বাড়ী, তাঁহারা অনেকেই বর্ষাকালে এই অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া থাকিবেন। বরিশাল হইতে খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানকার সাহেবেরা ইহাকে বরিশাল তোপ (Barisal gun) নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই শব্দ এত গভীর ও এত প্রবল যে শুধু বরিশাল নহে কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থান, সুন্দরবন এবং তন্নিকটবর্ত্তী নানাস্থান হইতে সমানভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কামানের শব্দ বা মানুষের কৃত কোন শব্দ নহে তাহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এক একবারে প্রায়ই ৬।৭ বার করিয়া শব্দ হইয়া থাকে, এবং বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোন কালে শুনিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক লোক জ্বরে যমের বাড়ী যাইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় এই শব্দটার সহিত যমের বাড়ীর একটা সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে। একথা সত্য মিথ্যা পাঠক পাঠিকা বুঝিবেন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে এই ভয়ানক শব্দ পৃথিবীর গর্ভ হইতে আসিতেছে এবং অতলস্পর্শই এই শব্দের উৎপত্তি স্থান, ইহাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন।

এই অতলস্পর্শ কি? অতলস্পর্শ শব্দের অর্থ এই যে যাহার তল স্পর্শ করা যায় না, অর্থাৎ যাহার গভীরতার সীমা নাই। বাস্তবিকই বাঙ্গালার দক্ষিণে, সমুদ্র মধ্যে এমন একটি স্থান আছে যাহা অতলস্পর্শ। উহা এত গভীর যে কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ সাহেব ইহার পরিমাণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া এই অতলস্পর্শের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন যে মাটি বৎসর বৎসর নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্তই এই গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িতেছে; পলি (Sediment) আর জন্মিতে

পায় না, কাজেই বাঙ্গালার আয়তনও আর বাড়িতেছে না। বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধির কথা যখন বলা গেল, তখন এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। পূর্ব্বে—কতবছর পূর্ব্বে তাহা বলিতে পারি না—তবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ ছিল না। হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্র ছিল। পরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতে নানা দেশের মাটি ধুইয়া আসিয়া ক্রমে চড়া পড়িয়া বাঙ্গালা দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। কেমন করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা ভূতত্ব পড়িলে জানিতে পারা যায়। বাঙ্গালার মাটি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত পাথর কি কাঁকর মিশ্রিত নয়; স্রোতের সঙ্গে যে মাটি ভাসিয়া আসে, বাঙ্গালার সকল স্থানেই সেই মাটি। পলি স্তরে স্তরে জমিয়াই যে বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভূতত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে, এখানে সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই। এখন কথা এই যে, স্রোতের পলি স্তরে স্তরে জমিয়াই যদি বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালা দেশটা ত ক্রমেই বাড়িয়া যাইবার কথা! কেন না পূর্ব্বের মত এখনও বৎসর বৎসর স্রোতে মাটি ভাসিয়া আসিতেছে। যে কয় সহস্র বছরে বাঙ্গালার এখনকার আকার হইয়াছে, আরও তত বছরে ত বাঙ্গালা ইহার দ্বিগুণ হইবে। কথা ঠিক। তাহা হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইতেছে না। কেন হইতেছে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি। আমরা বলিয়াছি বাঙ্গালা দেশ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া এই অতলস্পর্শের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর যে মাটি স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্তই এই অতলস্পর্শের মধ্যে পড়িতেছে। পলি আর জমিতে পায় না, কাজেই বাঙ্গালার আয়তনও আর বাড়িতেছে না। শুধু এই পর্য্যন্ত হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আশঙ্কার কথা আছে। কিছুকাল হইল এই প্রকাণ্ড গর্ত্তের সমুদ্রের মধ্যস্থ উত্তর দিকের নীচের ভাগটা কতকখানি এই অতলস্পর্শের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কাজে কাজেই সেই দিকের অর্থাৎ বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশের ভূমির উপর ভাগটা নামিয়া গিয়াছে। এই স্থান এখন সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে। আগে সেখানে সুন্দরবন ছিল না, এই স্থান নীচু হইয়া যাওয়াতেই সুন্দরবন হইয়াছে।

বাঙ্গালার মধ্যে এই স্থানই পূর্ব্বে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। আজ পর্য্যন্তও সুন্দরবনে যে সমস্ত পুরাতন ভগ্ন বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, ঢাকা মুরশিদাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানীতে তেমন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে স্থান এখন নামিয়া যাওয়াতে সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাই বাঙ্গালায় প্রধান রাজধানী ছিল। এই স্থান যে নীচু হইয়া গিয়াছে, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল এই স্থানের অধিকাংশ জলে ডুবিয়া থাকে। যদি পূর্ব্বেও এখনকার মত জলে ডুবিয়া থাকিত তবে আর এখানে বসতি হইতে পারিত না। ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে তাহা লিখিবার দরকার নাই।

পুরাণে আছে যে ভগীরথ যখন গঙ্গাকে আনিয়া পিতৃকুলের উদ্ধার করেন, তখন ভাগিরথী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সাগরে পতিত

হন, তার পর পাতালে প্রবেশ করেন। বলিতে পারি না, হয়ত এই অতলস্পর্শ পাতালেরই পথ। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের কাহারও যদি পাতাল দেখিবার সাধ থাকে তবে এই পথে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

যে কামানের শব্দের কথা আগে বলিয়াছি, অনেকে বলেন যে ইহা এই অতলস্পর্শ হইতে উঠিতেছে। বর্ষাকালেই এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কাজেই জল বেশী হওয়ার সঙ্গে ইহার একটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা যে কি তা এখনও ঠিক হয় নাই। সমস্ত স্থির জানিতে পারিলে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আমাদের পাঠক পাঠিকারা এ সম্বন্ধে কি মনে করেন, আমাদিগকে লিখিতে পারেন।

যাহা হউক এই অতলস্পর্শ আমাদের বড় মঙ্গলজনক নহে। ইহা হইতে যে কবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইবে বলা যায় না। একবার ইহার নীচের ভাগ ভাঙ্গিয়া পড়াতে বাঙ্গালা দেশের কতকটা নামিয়া গিয়া সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে, আবার হয়ত আরও ভয়ানক কোন ঘটনা ঘটিতে পারে। কবে যে ইহার বৃহৎ উদর পূর্ণ হইবে তাহা বলা যায় না, আর যতদিন তাহা না হইবে ততদিন বাঙ্গালাদেশেরও বিষম বিপদের আশঙ্কা। কোথাও কিছু নাই, সকলেই নিজ নিজ কাজ করিতেছে, আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, দিন যেমন যায় তেমনি যাইতেছে হয়ত হঠাৎ সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ইহার উদরসাৎ হইয়া যাইবে! যেখানে বাঙ্গালাদেশ ছিল সে স্থান হয়ত সমুদ্র হইয়া যাইবে। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে কি ভয়ঙ্কর কথা!

শ্যামচাঁদের পাঁচ দশা।

আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তিকে বালক কালে তামাক খাইবার অভ্যাস করিতে দেখা যায়। তামাক যে কি পদার্থ তাহা জানা না থাকাতেই লোকে এইরূপ ভ্রমে পড়ে। তামাক এক প্রকার বিষ। বিষের স্বভাব এই যে, তাহা উদরে গেলেই শরীরের বিকার উপস্থিত হইতে থাকে। ঘন ঘন বমি হয়, মাথা ঘোরে, চক্ষু বিকৃত হয়। মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়, এইরূপে শরীরের নিতান্ত অসুস্থ অবস্থা উপস্থিত করে। যে ব্যক্তির তামাক খাওয়া অভ্যাস নাই, তাহাকে যদি তামাক খাওয়াইয়া দেও, অমনি দেখিবে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তামাক এমনি বিষ, যদি তামাকের পাতা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল কাহাকেও খাইতে দেও তখনি সে ব্যক্তির বমন হইবে, মাথা ঘুরিবে, আর আর বিষের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইবে। তামাক পাতা খানিকটা কোন বালককে খাওয়াইয়া দেও সে ঘুরিয়া পড়িবে, হয়ত অজ্ঞান হইবে। এমন কি তামাকের ধুয়াঁ যে হুকার জলের মধ্য দিয়া যায় সেই জলটা চারি পাঁচ দিন বাদে কাহাকেও খাওয়াইয়া দেও, দেখিবে বিষের কাজ করিবে। অভ্যাসের এমনি গুণ যে অভ্যাসের জোরে এমন বিষও সহিয়া যায়। কিন্তু সহিয়া গেলে কি হয়, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, বালককালে তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে অনেক পীড়া জন্মিতে পারে। প্রথম—বালককালে, কোনরূপে তামাক খাওয়া অভ্যাস

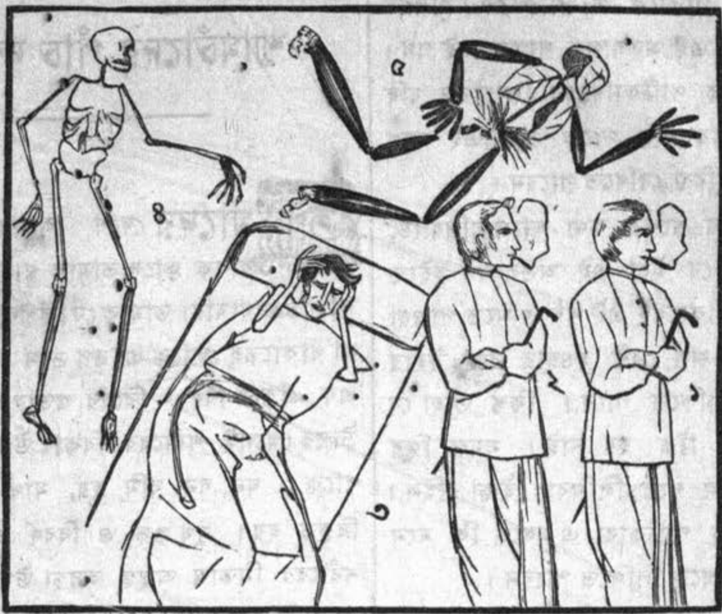

করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি কাস রোগ জন্মিতে পারে। মস্তিস্ক খারাপ হইয়া যায়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়। শিরঃপীড়া জন্মিতে পারে। অতিরিক্ত চুরুট খাইয়া বালকদিগকে এই সকল পীড়াতে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বালক-কালে তামাক খাইতে শিখিয়া অনেক ভাল ছেলে বোকা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে। এই সকল কারণে বালকের মুখে চুরুট দেখিলে আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। উপরে ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। চুরুট খাইতে শিখিয়া একটী বালকের কি দশা হইয়াছে দর্শন কর।

প্রথম দশা।

গাঁটা গোঁটা মোটা সোটা নধর সুন্দর।
বালক দোলায়ে কোঁচা হয় অগ্রসর ॥
তেঁরি কাটা ফিটফাট চুরটটী মুখে।
উড়াইয়া ধূঁয়া বাবু চলিছেন সুখে ॥
গোল গোল হাসি হাসি মুখখানি তার
ধূঁয়াবৃত ; মেঘাবৃত চাঁদের আকার।
ছেলে হয়ে বুড়া সাজ ধূঁয়া উড়াইয়া
ছড়ি হাতে যায় শ্যাম বুক ফুলাইয়া।

দ্বিতীয় দশা।

ওই আসে শ্যামচাঁদ, চুরুটের গুণে
নবীন বয়সে তারে ধরিয়াছে ঘুণে।
হয় না হজম ভাল, নিত্য মাথা ধরে,
সকালে প্রত্যহ পেট ভুট ভাট করে ;
তামাকের বিষে দেহ যায় শুকাইয়া,
এমন নধর দেহ গেছে পাকাইয়া ;
তবু ছড়ি হাতে বাবু চুরুটটী মুখে,
না ভেবে নিজের দশা চলেছেন সুখে।

তৃতীয় দশা।

দেখ দেখ শ্যামচাঁদ অস্থি চর্ম্ম সার,
আঁতে আঁত দাঁতে দাঁত, বিকৃত আকার।

মাথার ব্যাথাতে স্বস্তি নাহি রাত্রি দিনে,
শিরে হাত দিয়ে কাঁদে চুরুটের গুণে।
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত সবে ঘৃণা করে,
সতত অসুখী সদা, মরি মরি করে।
চুরুটে কাশের রোগ, ক্ষয় পেয়ে যায়,
তেমন সুন্দর কান্তি কোথায় মিলায়।

চতুর্থ দশা।

হাড্ডিসার শ্যামচাঁদ এইবারে ভুত,
চুরুটে খেয়েছে তারে অভাগার পুত।
কাটিকাটি পাছুখানি কাটি কাটি হাত,
অস্থির পঞ্জর পেটে নাহি তাহে আঁত।
হাড় মাঝে দাঁত পাটি অতি ভয়ঙ্কর,
এই কি সে শ্যামচাঁদ নধর সুন্দর।
দেখিলে শ্যামের রূপ তরাসে পলাই,
চুরুট তোমার গুণ বলি হারি যাই!

পঞ্চম দশা।

তামাকের ভক্ত শ্যাম, তামাক সেবায়
মরিল অকালে, তাই দেবতা তাহায়
দিল এই নব জন্ম, হাতগুলি তার
চুরুটেতে গড়া হলো, চুরুটের পা,
তামাক পাতায় গড়া দেখ সর্ব্ব গা,
নর জন্ম গিয়ে হলো তামাক জনম,
তেমনিত ফল হয় যেমন করম।

ধাঁধা।

গত জুলাই মাসের সচিত্র ধাঁধার উত্তর।

কলিকা—তাস—কল—রকম—দোকান—মালাযপ—রিপু—র্ণ। পৃথিবী—রস—কলম—ত অবলম্বী—লো—কই—আছে।

কলিকাতা সকল রকম দোকান মালায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সকল মতাবলম্বী লোকই আছে।

নূতন ধাঁধা।

১। একজন পয়সায় তিনটা করিয়া ১০০টা ডিম এক দোকানদারের নিকট হইতে, এবং পয়সায় ২টা করিয়া ১০০টা অন্য এক দোকান-দারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া পর দিন ২ পয়সায় ৫টা হিসাবে ডিমগুলি বিক্রয় করিল। তাহার কত লাভ বা লোকসান হইল বল দেখি?

সখা
চতুর্থ ভাগ। দশম সংখ্যা।

অক্টোবর, ১৮৮৬।

পরলোক-গত
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! পূজার সময় সমুদায় বঙ্গদেশের লোক যখন আমোদ কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন আমাদের দেশের একটী রত্ন আমরা হারাইয়াছি। আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে তোমাদিগকে কত দুঃখের সংবাদই দিলাম। যাঁহারা দেশের মুখশ্রী স্বরূপ ছিলেন, এরূপ এত লোক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে হারাইব তাহা আমরা জানিতাম না। ইঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া জানাইতে পারি না।

আজ যাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি তাঁহার নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ইঁহার নাম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস তোমরা অনেকে পড়িয়া থাকিবে; অথবা ইঁহার রচিত "মিত্র বিলাপ" নামক কবিতা পুস্তকও তোমরা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে তোমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছ, তাহা অতি সামান্য। তাঁহার যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও সদগুণ ছিল তাহার অল্পই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি তাঁহার যে কত বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, তাহা দেশের অনেক বড় বড় লোকেও জানিতেন না। ইহার কারণ এই, তিনি আপনার গুণ সকল বিনয়ের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। কত লোক দেখিতে পাই, যাহারা একগুণ থাকিলে দশগুণ দেখায়; যে বিদ্যা নিজের নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করে; মান সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য কত কৌশল কত ফন্দি করে; পদস্থ লোক-দিগের সহিত মিশে ও তাঁহাদের তোষামোদ করে; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও বিনীত ছিলেন, সামান্য লোকের ন্যায় বেড়াইতেন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এত বড় লোক।

অনুমান ১৮৪৬ সালে নদীয়া জেলার একটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় রাজকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তাঁহার ভ্রাতা, ইস্কুল সমূহের সুবিখ্যাত ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। বালককাল হইতে রাজকৃষ্ণ পাঠে অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। ধীর শান্ত স্বভাব, ও পাঠে মনোযোগী হওয়াতে তিনি সকলের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন

কালেজে পড়েন তখনই তাঁহার সুখ্যাতি দেশে রাষ্ট্র হইয়াছিল। সকলেই বলিত ঐ বালকটী কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। আমরা তখনই তাঁহার অশেষ প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। তিনি যখন (Philosophy) অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন, সেই উপাধি দিবার দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধিনায়ক সার হেনরি মেইন তাহাকে প্রকাশ্য সভার মধ্যে বলিয়া দিলেন দর্শন বিষয়ে তিনি (রাজকৃষ্ণ) যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের অাক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ ছাত্রের পক্ষেও প্রশংসনীয়।

এই যশ ও অভিনন্দন লইয়া রাজকৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে উকীলের কাজ করিবেন। কিন্তু তাহা তাঁহার পোষাইল না। পোষাইবে কেন? নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র পাঠ করাতে যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, ওকালতি কার্য্য তাঁহার জন্য নয়। রাজকৃষ্ণ ত্বরায় সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চ প্রোফেসারের পদ পাইয়া জেনেরাল এসেম্বি্ল কালেজ, পাটনা কালেজ, কটক কালেজ, বহরমপুর কালেজ, প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি অনেক কালেজে কাজ করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার গভীর বিদ্যা, অসাধারণ বুদ্ধি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্রের সাধুতা, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কালেজে পড়িবার সময় আমরা যেমন তাঁহার যশ শুনিয়াছিলাম, শিক্ষকতা করিবার সময়ও সেইরূপ যশ শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ ও বন্ধুতা হইল। আলাপ হইয়া তাঁহার চরিত্রে যে সাধুতা দেখিতে পাইলাম, তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি যেন তাহার নিকট সামান্য বোধ হইতে লাগিল। এমন প্রবল জ্ঞান-পিপাসা আমরা অতি অল্পলোকেরই দেখিয়াছি। মানুষ যাহা জানিতে পারে, ও যাহা জানিলে মানুষের উন্নতি হয় এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা প্রিয়-বন্ধু রাজকৃষ্ণ জানিতে উৎসুক হইতেন না। জানিবার জন্য তাঁহার এতদূর ব্যগ্রতা হইত যে যতক্ষণ বিষয়টা পড়িয়া শেষ না করিতেন ততক্ষণ যেন আহার নিদ্রা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইত। কোন একটী নূতন বিষয়ে এক খানি পুস্তক কলিকাতার কোন বন্ধুর হাতে আসিয়াছে, খবর পাইলে তিনি তাহা পাঠ করিবার জন্য হয় ত দশবার তাঁহার বাড়িতে হাঁটাহাঁটী করিতেন। বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা হইলে কেবল সেই কথা। আমরা তাঁহার সঙ্গে আধ ঘণ্টা বসিয়া এত নূতন বিষয় শিক্ষা করিতাম, যাহা দুইমাস পড়িয়াও শেখা যায় না। আজ বঙ্গদেশ একটী অমূল্য ধন হারাইয়াছেন, আমাদের সে দুঃখ ত আছেই, তাহার উপরে আজ এই দুঃখে চক্ষে জল আসিতেছে, এমন বন্ধু হারাইয়াছি যাঁহার সহিত আলাপেও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত।

দেশের কত লোকে ত প্রোফেসার হয়, বড় চাকুরী করে, মোটা মোটা মাহিয়ানা পায়। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সে চাকুরীতেই বদ্ধ থাকে। তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। খান, দান, পরিবারের গহনা গড়ান, ছেলে মেয়ের শিক্ষা দেন; না কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, না কোন প্রকারে সঞ্চিত জ্ঞানকে দেশের কাজে লাগান। আমাদের রাজকৃষ্ণ সে ধাতুর লোক ছিলেন না।

তিনি শিক্ষকতা কাজে রত থাকিবার সময় ফরাসি, উর্দ্দু, উড়িয়া, সংস্কৃত, আসামী, জর্ম্মান, পারসী, লাটিন ও পালি প্রভৃতি ভাষা শিখিয়াছিলেন। ফরাসি-দর্শনকারদিগের গ্রন্থ সকল পড়িবার জন্য এত ব্যাগ্রতা ছিল যে ফরাসি ভাষা না শিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে সেই জ্ঞানের ফল দেশবাসিদিগকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সে সময়ে "বঙ্গদর্শন" নামে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। রাজকৃষ্ণ ঐ পত্রিকার একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাহাতে অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি পড়িয়া অনেকে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের যে এত সুখ্যাতি হইয়াছিল তাঁহার লিখিত প্রস্তাবগুলি তাহার এক প্রধান কারণ।

উড়িষ্যাতে তিনি যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন কিসে উড়িষ্যাবাসিদিগের উন্নতি হয় সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন; এবং সে দেশীয় ছাত্রদিগকে লইয়া নানা প্রকার সভা করিয়া তাহাদিগকে সৎ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। আমরা বলিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান লাভে তাঁহার যত্ন ছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। যাহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চা দেশ মধ্যে প্রবল হয় ইহা তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। কেবল তাহা নহে, "এসিয়াটিক সোসাইটী" নামে এদেশে একটী সভা আছে। অনেক বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় লোক তাহার সভ্য। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করা এই সভার উদ্দেশ্য। রাজকৃষ্ণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনাতে এত অনুরাগী ছিলেন যে এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য পালী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী বড় কাজ পাইয়াছিলেন। তাহাতে মাসে ১০০৲ শত টাকা পাইতেন। দেশীয় সংবাদপত্র সকলের প্রধান অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা, ও যত আইন প্রস্তুত হয় তাহার অনুবাদ করা, তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ইহাতে তাঁহাকে গুরুতর মানসিক শ্রম করিতে হইত। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন, মন যেন স্ফূর্ত্তি-হীন হইয়া আসিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, শ্রমটা কিছু অতিরিক্ত করিতে হয়। এই গুরুতর শ্রম করিয়াও তিনি জ্ঞান চর্চ্চা হইতে একটী দিনের জন্য বিরত হন নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ধর্ম্ম-বিষয়ে চিন্তা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করিতেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, চিত্তশুদ্ধি কিরূপে লাভ করা যায়, এই সকল চিন্তা করিতেন। তিনি যখন এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব করিতেন তখন তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতা ও বিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে সহর ত্যাগ করিবার সময় কথা হইল যে শীঘ্র আসিয়া আবার সাক্ষাৎ হইবে ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু হায়! আর সাক্ষাৎ হইল না। রাজকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একাকী সংসারের ভার বহন করিবার জন্য রাখিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে শোকসাগরে ফেলিয়া, আমাদের ন্যায় বন্ধুগণকে

বিচ্ছেদ দুঃখে নিমগ্ন করিয়া ও বঙ্গভূমিকে ক্ষতি গ্রস্থ করিয়া ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। এ ক্ষতির আর ত্বরায় পূরণ হইবে না।

ঢাকাই মস্‌লিন।

আমরা গত দুইবারে এই মস্‌লিন সম্বন্ধে সুতা কাটা হইতে তাঁতে কাপড় বুনা পর্য্যন্ত চিত্র সহিত দেখাইয়াছি। * এবারে অবশিষ্ট দুইটি চিত্র দেখান যাইতেছে :—

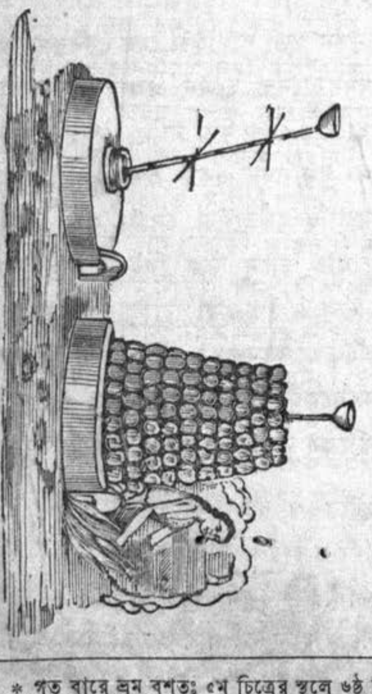

৭ম চিত্র।

৭ম চিত্র—পাশাপাশি দুইটি "ভাটি" দেখান হইয়াছে। বামদিকেরটি শুদ্ধ ভাটির চিত্র এবং ডাইনদিকেরটি ভাটিতে কাপড় সাজান হইলে কিরূপ দেখিতে হয় তাহার চিত্র, পাঁড়াগায়ে হয়ত অনেক ধোপার ভাটি দেখিয়া থাকিবেন সেইজন্য আমরা আর তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম না। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ঢাকাই মস্‌লিন যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তদনুরূপ সতর্কতার সহিত এই কাপড় ধোয়া আবশ্যক। সুতরাং ধোপারা অন্যান্য কাপড় যেমন দুইএকবার মাত্র ভাটি করিয়া পাটে আছড়াইয়া পরিষ্কার করে মস্‌লিন বস্ত্র সেরূপ না করিয়া ক্রমাগত ১০।১২ বার ভাটি করা হয় এবং পাটে খুব অল্প পরিমাণেই আছড়ান হয়। আবুল ফজেল নামক কোন এক ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সোণারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের অন্তঃর্গত কাটারাসুন্দা নামক স্থানের জলই মস্‌লিন ধুইবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইদানীং নারায়নদিয়া হইতে তেজগাঁ পর্য্যন্ত সচরাচর কাপড় ধোয়া হইয়া থাকে। পুরাকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সওদাগরদিগের আমলে তেজগাঁয়ে অনেকগুলি কাপড় ধুইবার আড্ডা ছিল কিন্তু সেই সমস্ত বিদেশীয় দিগের কুঠি নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তেজগাঁয়ের অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে, মস্‌লিন্ বস্ত্র ১০।১২ বার ভাটিতে চড়ান আবশ্যক। প্রতি রাত্রে কাপড় ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষারজল মাখাইয়া রৌদ্রে শুখাইতে হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন গত হইলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়। এই সময় জলের সহিত লেবুর রস মিশান বড় দরকার। তাহা হইলে কাপড়ের শ্বেত বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। থান প্রতি একটি

* গত বারে ভ্রম বশতঃ ৫ম চিত্রের স্থলে ৬ষ্ঠ চিত্রটি এবং ৬ষ্ঠ চিত্রের স্থলে ৫ম চিত্রটি দেখান হইয়াছে।

করিয়া বড় লেবুর রস হইলেই চলে। শাদা কাপড়ের জন্য যেমন লেবু তেমনি কার্পাস ও মুগা (রেশম) মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্য লেবুর রস ও চিনি ব্যবহার করা হয়; কারণ, শুনা যায় চিনিতে রেশমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। জুলাই হইতে নবেম্বর এই কয়মাস মস্‌লিন ধুইবার উপযুক্ত সময়। যে কাপড় যত বার ভাটি করা হইবে তাহা সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইবে এবং ধোপ দিবার খরচাও সেইমত বাড়িবে। এইজন্য ১০০ থান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩০৲ টাকা

৮ম চিত্র।

হইতে কখন কখন ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত পড়তা পড়ে।

৮ম চিত্র—পাটে আছড়াইবার সময় মস্‌লিনের সূক্ষ্মতর সূতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়ে। কাপড় ধোয়া হইলে সেই স্থানভ্রষ্ট সূতাগুলিকে কেমন করিয়া দোরস্ত করা হয় তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। একদিকে জমির উপরে দুটি খোঁটার সহিত সংলগ্ন একটি "নরদ" বা দণ্ডে দুইজন কাপড়ের থানটি গুটাইয়া ধরিয়া আছে অপর দিকে আরএকজন ঐ থানের খানিকটা বিস্তার করিয়াছে, মধ্যস্থলে চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহার সূতা হেলাগুছা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া দিতেছে।

পাটে আছড়াইবার সময় অনেক সূতা ছিড়িয়াও নষ্ট হইয়া যায়। রিফুগারেরা সেই সূতার পরিবর্ত্তে নূতন সূতা লাগাইয়া দেয়। রিফুগারিতে ঢাকার মুসলমানেরা যেমন ওস্তাদ এমন প্রায় অপর কাহাকেও দেখা যায় না। একজন সুদক্ষ রিফুগার ২০ গজ লম্বা একটি সূক্ষ্ম মস্‌লিন থান হইতে একগাছি ছেঁড়া বা মোটা সূতা বাহির করিয়া তাহার স্থানে ঠিক সেইরূপ লম্বা আর একগাছি ভাল ও সূক্ষ্ম সূতা পরাইয়া দিতে পারে!! ঢাকায় এইরূপ অনেকঘর রিফুওয়ালা আছে। ইহাদের অনেকেই আফিন খায় এবং শুনা যায় নেশার ঝোঁকেই উহারা উত্তমরূপ কাজ করিতে পারে।